শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

এম-এ, ডি. ফিল

দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—পুনর্যাত্রা (২৯শে আষাঢ়), ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

শ্রীরামকৃষ্ণের
অগণিত ভক্তবৃন্দের
উদ্দেশে

॥ ভূমিকা ॥

দর্শনশাস্ত্রের বিদগ্ধ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী লিখিত "শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা" একটি আলোচনা বা অনুশীলনমূলক গ্রন্থ—যে গ্রন্থ সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-ব্যাপী সাধনা, চিন্তা ও সত্যোপলব্ধির দিব্য-ফলশ্রুতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনতত্ত্বের একটি নির্দিষ্ট পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে।

একথা সত্য যে, শুধুই অবতারকল্প মহামানবের সমগ্র জীবনের চিন্তাধারা ও সাধনার মধ্যেই নিহিত থাকে না একটি দার্শনিক রূপ, পরন্তু প্রতিটি মানুষের জীবনকর্মে ও চিন্তাধারার মধ্যেই পরিচয় পাই আমরা দর্শনতত্ত্বের স্বতন্ত্র একটি রূপ এবং সেই দর্শনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝার চেষ্টা করি সেই মানুষকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও যে এক অভিনব চিন্তাধারার পরিস্ফুটন ছিল তা অনস্বীকার্য এবং সেই দিব্য-জীবনচিন্তাই তাঁর কল্যাণময় দর্শনরূপকে সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান গ্রন্থের চিন্তাশীল লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সেই জীবনতত্ত্বনিষ্ণাত চিন্তা, সাধনা ও কর্মের আলোচনা করে একটি দর্শন-রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে।

প্রসংগক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অবতারকল্প মহামানবগণ বা ঈশ্বরাবতারগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন বিশেষ একটি ভাগবতী কল্যাণী ইচ্ছা এবং ব্রত নিয়ে। গীতার মধ্যেও আমরা পাই—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় আচার্য শঙ্কর সে মহান্ উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেছেন :" স চ ভগবান * * ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য * * স্বমায়য়া 'দেহবানিব জাত ইব চ' লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া।" ভাষ্যে 'লক্ষ্যতে' শব্দটি ঈশ্বরের অবতার-রূপে আবির্ভাব বা অবতরণের উদ্দেশ্য ও ব্রতকে আরও স্পষ্টতররূপভাবে বুঝিয়েছে, কেননা স্বয়ং

ঈশ্বর ব্যতীত লোকনায়করূপে অবতরণ করার সামর্থ্য ও সার্থকতা আর কারুরই নাই, অথচ অবতারগণ দেশ-কাল-নিমিত্ত-রূপ মায়ার জগতে সাধারণ মানুষের মতো জীবনচিন্তা ও জীবনকর্ম (আচরণ) নিয়েই আসেন—যদিও স্বরূপে থাকেন স্বাক্ষী ও পরমচৈতন্যস্বরূপ। যুগপ্রয়োজনেই ঈশ্বরাবতারগণ পৃথিবীর বুকে আসেন এবং এই যুগপ্রযোজন অতীতে বহুবারই হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেও এই ঈশ্বরাবতার বা ঈশ্বরের অবতরণ প্রভৃতির কথা ইংগিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন: "থলো থলো রাম, থলো থলো কৃষ্ণ", অর্থাৎ অসংখ্য অবতার সেই একই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রূপ এবং অসংখ্য অবতার। নিজের অবতরণরহস্যের পরিচয় দিযে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেছেন: "এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য-পরিদর্শন"; রাজা বা ঈশ্বর স্বয়ংই অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। তবে ছদ্মবেশে অর্থাৎ আসল স্বরূপে একটু মায়ার আবরণ দিযে তাঁর অবতরণ, কেননা মাযাব আবরণ না দিলে যেমন একদিকে তাঁর অবতরণ ('দেহবানিব জাত ইব') সার্থক হয় না, তেমনি অন্যদিকে সাধারণ রূপ ও স্বভাব আশ্রয় করে না এলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে ধরা বা বুঝা সম্ভব হয় না। অবতার-পুরুষদের জীবন ও আচরণকে অনুসরণ করেই জীবন গঠন করে সকল সাধারণ মানুষ এবং তারই জন্য অবতার-পুরুষগণ জীবন-কর্মের, সাধনার ও তত্ত্বোপলব্ধির আদর্শ স্থাপন করেন পথভ্রান্ত মানুষের সম্মুখে ও সেই আদর্শ অনুসরণ করেই সকলে অগ্রসর হয় তাদের জীবনসিদ্ধির পথে—"স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্তেতে" (গীতা ৩।২১)। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে ভাগবতলীলার প্রকাশ আরও নূতন ও স্বতন্ত্র। সুতরাং সেই নূতন ও বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই আমাদের জীবনসাধনার পথে জানা ও বোঝা একান্ত প্রয়োজন।

জ্ঞানপ্রবীণ ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী সকল মানুষের জন্য সেই জানা ও বোঝার পথে একটি অভিনব যুক্তি ও বিচারের দীপশিখাই প্রজ্জ্বলিত করেছেন—যে আলোকময় পথে মানুষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনকর্ম, চিন্তা ও সমন্বয়ী সাধনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি ধর্ম ও দর্শনচিন্তার পরিচয় লাভ করে এবং যে চিন্তার আলোকে সকল মানুষই তাদের নিজেদের জীবনচিন্তা ও কর্মকে প্রদীপ্ত ও পরিচালিত করে ধন্য হয়। ঊনবিংশ-বিংশ

শতকের সংঘাতময় সমাজজীবনে মানুষ স্বতঃই পথভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত, তাই অসংখ্য মত ও পথের সম্মুখীন হয়ে তারা বেছে নিতে চায় জীবনসিদ্ধির নির্দিষ্ট একটি সর্বসমন্বয়ী উদার মত ও পথকে। যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম ও সাধনার অনুষ্ঠান করে উপলব্ধি করেছিলেন জীবনে সর্বদ্বন্দ্বহীন এক অদ্বিতীয় সত্যকে—যে সত্য 'সূত্রে মণিগণা ইব'—সকল ধর্মমত ও সাধনপথের সঙ্গে সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত আছে এবং এক ও অদ্বিতীয় চিরন্তন সত্যের পাদপীঠে বিধৃত।

ডক্টর চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মে ও সাধনায় অনুভূত সত্যকে বলেছেন এক অদ্বৈততত্ত্বেরই রূপ বা প্রতিফলন—যদিও সেই অদ্বৈততত্ত্ব আচার্য শংকর-প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্ব নয় এবং সংগে সংগে একথাবও তিনি আভাস দিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ ও প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্ব ও অদ্বৈতবাদ রামানুজ, মাধব, নিম্বাক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীচৈতন্য, ও অন্যান্য অবতার ও মহামানবদের মতবাদের হুবহু অনুকরণ বা প্রতিফলন নয়। তন্ত্র বা তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন; বৈষ্ণব, বাউল ও অন্যান্য ধর্মসাধনা তিনি করেছেন চরমসত্য এক—কি বহু তা অনুভব করার জন্য, কিন্তু সেজন্য আপন ধর্মমত ও মতবাদকে তিনি অন্যান্য ধর্মমতে ও মতবাদের পাদপীঠে বিসর্জন দেন নি, বরং বলেছেন, সকল ধর্মমত বা পথই সত্য সেই এক সত্যস্বরূপ পরমবস্তুকে লাভ করার জন্য। আমরা শ্রীনীরদবাবুর 'শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেই বলি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈততত্ত্ব-সম্বন্ধে কী সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"আমাদের ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণ একপ্রকার অদ্বৈততত্ত্বই প্রচার করেছেন। কিন্তু এই অদ্বৈততত্ত্ব নিশ্চয়ই লোকপ্রসিদ্ধ শংকরাচার্যের অদ্বৈততত্ত্ব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈততত্ত্ব অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ এবং বিশেষ করে তান্ত্রিক ধারণার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, শিব-শক্তি সবই সত্য। যেমন জল আর বরফ। জল নিরাকার ব্রহ্ম, বরফ সাকার ঈশ্বর বা কালী। নেতি নেতি করে ব্রহ্মে পৌঁছিলে জীব জগৎ মিথ্যা হয় না, ব্রহ্মই জীব-জগৎ হয়েছেন—এই বোধ হয়।"

এর পর ডক্টর চক্রবর্তী আচার্য শংকর ও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনমতের কিছু কিছু পার্থক্যের উল্লেখ করে পরিশেষে বলেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণের চরমতত্ত্ব বা সত্য কোন সমন্বিত তত্ত্ব বা সত্য (Synthetic Reality) নয়, ইহা বিকল্পে প্রকাশিত অদ্বৈততত্ত্ব (A Reality expressed in alternative forms)। * * তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈততত্ত্বও সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি তাঁর বিকল্প প্রকাশ মাত্র। সাধকেরা তাঁদের রুচি, প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভংগীর বিভিন্নতার জন্য একই সত্যকে বিভিন্ন বিকল্পের মাধ্যমে দেখেন। কোন বিকল্পই মিথ্যা নয়, সুতরাং বর্জনীয় নয়। সমস্ত সাধকেরাই বিভিন্ন বিকল্প-পথে বিভিন্ন নদীর মতো একই সত্য-সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সেখানেই তাঁদের যাত্রার শেষ, পরমাপ্রাপ্তি ও পরমা তৃপ্তি" (—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, পৃঃ ৯৯—১০০)।

ইতিপূর্বে দুটি গ্রন্থ (ইংরাজীতে) ও কিছু কিছু আলোচনাও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে এবং ডক্টর চক্রবর্তীর গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন-বিচারের ক্ষেত্রে তৃতীয় আলোচনা-গ্রন্থ। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এজন্য যে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বসমন্বয়ী ও সার্বভৌমিক উদার দৃষ্টি নিয়ে 'যত মত তত পথ' মহামন্ত্র উপলব্ধি ও প্রচার করেছেন একথা আমরা জানি, কিন্তু যুক্তি, নিষ্ঠা ও বিচারের পরিপ্রেক্ষণে এখনও আমরা শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম বা শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন অদ্বৈতবাদের অনুকূলে হলেও সেই অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈততত্ত্ব যথার্থই আচার্য শংকর ও শংকর-সম্প্রদায়-প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈততত্ত্বের হুবহু অনুকরণ ও প্রতিফলন নয়, বরং তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, অথচ ঐ অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় শংকরের অদ্বৈততত্ত্ব, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্ব, তন্ত্রাচারীগণের শক্তি-বিশিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব ও মাধব, বল্লভ, নিম্বার্ক প্রভৃতির দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতির সংগে একটি মৈত্রী ও সমন্বয়ী সূত্র। রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—এই সকল যোগসাধনার চরমতত্ত্বও শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ সর্বানুস্যূতিমূলক অদ্বৈততত্ত্বের সংগে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। উনবিংশ-বিংশ শতকের বাদদ্বন্দ্বময় সমাজে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব মৈত্রীমন্ত্রাভিষিক্ত অদ্বৈততত্ত্ব মিলন ও শান্তির পরিবেশই সৃষ্টি করবে এবং বিচিত্র সাধনাভিমুখী

বিচ্ছিন্ন সাধকমনকে অবিচ্ছিন্ন একটি অখণ্ড সত্যানুভূতির দিক্ দর্শন করতে সক্ষম হবে।

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তীর সুলিখিত ও সুদীর্ঘ-দিন-অনুশীলিত এই গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা' নিঃসংশয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক ধর্ম ও সাধনার নিরাবরণ রূপের পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসমাজে ও সর্বসমাজের চিন্তাশীল মানবের কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হোক এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

নিবেদন

ভারতীয় ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান অবিস্মরণীয়। এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণে প্রসঙ্গে অন্যান্য সাধনার তুলনামূলক আলোচনা এসে পড়েছে। আমরা বৈষ্ণব সাধনা, মাতৃ সাধনা, বাউল সাধনা, মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের সাধনা, খ্রীষ্টীয় মিষ্টিক সাধনা, সুফী সাধনা প্রভৃতির প্রকৃতি আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল দুইই দেখাতে চেষ্টা করেছি।

ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে সম্ভব আলোচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় তা কি রূপ-পরিগ্রহ করেছে, আমরা তা প্রদর্শন করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য যে সমস্ত সাধক আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের সাধনার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার তুলনা করা হয়েছে। রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি তুলনামূলক আলোচনাও সংযুক্ত করেছি।

অবতারবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন কি-না, এই প্রশ্নও আলোচনা করা হয়েছে। এমন বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে এর আগে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাবে আমাকে নিয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের সম্পাদক প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত করেছেন। আমি তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

রীডার্স কর্নার ও বোধি প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করার চেষ্টাও করেছেন তিনি প্রচুর। তাঁকে আমার ধন্যবাদ।

সূচীপত্র

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার স্বাতন্ত্র্য

মুক্ত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোকশিক্ষার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে সাধনার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন তা অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষ সাধু, সন্ত আর সিদ্ধপুরুষের দেশ। এই দেশে কত সাধক যে কত সাধনার ধারা প্রবাহিত করেছেন তা আলোচনা করলে বিস্মিত হ'তে হয়। আমাদের দেশে রাজপুত্র স্বেচ্ছায় কৌপিন ধারণ করেন, প্রতিষ্ঠা পান রাজার চেয়ে শতগুণ বেশী সাধকের দল। এই বিচিত্র সাধকের দেশে জন্মেও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সাধনার স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। আমাদের বিশ্বাস, শুধু ভারতবর্ষে কেন বিশ্বের সাধকদের ইতিহাসে এমন সাধনার কথা আর কখনও শোনা যায়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সেই স্বাতন্ত্র্য-কথা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সাধনার ইতিহাসে আমরা দেখি, বিভিন্ন সাধক নিজ নিজ বিশিষ্ট সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে সিদ্ধি লাভ করেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সাধক যে পথে সিদ্ধি লাভ করেন, মুসলমান সাধক সে পথে অগ্রসর হন না। কিন্তু, তিনি নিজস্ব সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণার পথে অগ্রসর হ'য়ে ইষ্ট লাভ করেন। হিন্দুসাধনার ধারা আবার ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। হিন্দুসাধনার মূলধারা থেকে যে কত শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে তার হিসেব অনেকের জানা নেই। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত সব সাধনাই ত হিন্দুসাধনা। এ সব শাখা-পথে অগ্রসর হ'য়ে কত সাধক যে সিদ্ধির সাগরে গিয়ে পৌঁছেছেন তার কথা জানা সহজ নয়। সব ধর্মেরই সারকথা এক, বিভিন্ন ধর্ম ও সাধন-পথেই সিদ্ধিলাভ করা যায়, এমন ধরণের বক্তব্য তাত্ত্বিক আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরেই স্বীকৃত।

কিন্তু, কোন সাধক বিভিন্ন সাধন পথে অগ্রসর হ'য়ে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং পরে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন, সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত সাধনাই সিদ্ধি আনে, এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে কখনও শোনা যায় নি।

চর্চা এক জিনিস, চর্য্যা অন্য জিনিস। আলোচনায় যা পাই তার চেয়ে জীবন দিয়ে যা বুঝি তার গভীরতা অনেক বেশী। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ নিশ্চয়ই অনেক বেশী কার্যকরী। ভারতবর্ষ কোন দিনই বিভেদের কথা বলেনা, দ্বন্দ্বকে চরম বলে ভাবেনা; অভেদ, সমন্বয় এবং মিলনই সনাতন ভারতের শাশ্বত বাণী। এখানে সাকার, নিরাকার, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সমস্ত সাধনারই সাফল্য স্বীকৃত হয়েছে। স্বয়ং ভগবান গীতায় বলেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ (হে পার্থ, যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই অনুগ্রহ করি। মানুষ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, আমাতেই পৌঁছবে)।' সুতরাং তত্ত্বের দিক থেকে, বিশ্বাসের দিক থেকে, সমস্ত ধর্মপথের শেষে পরমাপ্রাপ্তির তৃপ্তিতেই আমরা আস্থাশীল। কিন্তু, কেউ যদি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এই প্রতীতির সত্যতা অকম্পিত দীপশিখার মত তুলে ধরতে পারেন তবে তিনি সমন্বয়ের বাণীর প্রতিধ্বনি মানুষের অন্তরের বীণায় যে ভাবে অনুরণিত করে তুলবেন অন্যের পক্ষে তা করা ত সম্ভব হ'বে না। সেজন্য বলা হয়েছে চর্চা আর চর্য্যায় তফাৎ আছে। জীবন যখন বাণী-মূর্তি ধারণ করে তখন সেই বাণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি যত অমোঘ ও অব্যর্থ হয়, অন্য কোন ভাবেই তা হ'তে পারে না।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন ভারতের ধ্যান-ধারণার সার কথা জীবন-সাধনার মধ্য দিয়ে রূপ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যুগ যুগ ধাবিত ভারতীয় সমন্বয় চিন্তার মূর্ত প্রকাশ। তিনি নিজে বিচিত্র

সাধনার পথে অগ্রসর হ'য়ে মুক্তির সর্বধর্মসমন্বয়ের অবারিত প্রাঙ্গনে সবাইকে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বানের আন্তরিকতা এবং গভীরতা এত বেশী যে তা প্রত্যাখ্যান করা, অবিশ্বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার **প্রথম স্বাতন্ত্র্য**। তিনি সব সাধন-পথেই অগ্রসর হয়েছেন, সিদ্ধিও মিলেছে তাঁর সব পথেই। এমন অদ্ভুত সাধনার কথা আমাদের ত আর জানা নেই। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"[১]

সর্বধর্মসমন্বয়ের ঋষির এই যে ব্যক্তিগত সাধনার অভিজ্ঞতার কথা এর মধ্যে যেমন একটা অকপট প্রকাশের মাধুর্য আছে, তেমনি আছে গভীর অনুভূতির সত্যের ঔজ্জ্বল্য। এটা নিছক তত্ত্বকথা নয়, ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত ঘরোয়া কথা। একে অস্বীকার করে সাধ্য কার?

বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-ভিত্তিক বহিরঙ্গের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পৃথিবীতে বার বার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কলহ দেখা দিয়েছে, রক্তপাতও হয়েছে প্রচুর। বিভিন্ন ধর্মে আরাধ্য দেবতার নাম ও প্রকৃতির বিভিন্নতা নিয়েও অনেকের মনে নানা ধর্মের স্বরূপগত ভিন্নতার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়েছে। আমরা অবশ্য তাত্ত্বিক বিচারে বিভিন্ন ধর্মের স্বরূপগত ঐক্যের পরিচয় অনেক দিন ধরেই পেয়েছি। কিন্তু, সর্বধর্মসমন্বয়ের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে যেমন করে একথা ঘোষণা করতে পেরেছেন তেমন করে অন্যের পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "আমার ধর্ম

---

১ কথামৃত, ৩।৩।১ (তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। এর পর কেবল সংখ্যা দেওয়া হল। প্রথম সংখ্যায়—ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায়—খণ্ড এবং তৃতীয় সংখ্যায়—পরিচ্ছেদ বুঝতে হবে।

ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে Water, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি, কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।"[২]

কথার মধ্যে কোথায়ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নেই। কিন্তু, এই অতিসাধারণ কথার মধ্যে এমনই একটা আন্তরিকতার সুর আছে যা মর্মে প্রবেশ করে। আটপৌরে গল্পের মধ্য দিয়া তত্ত্বকে সকলের বোধগম্য ও অন্তর্ভেদী করার জন্য এমন কথাই দরকার।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, এ সমস্যা অনেককেই বিব্রত করে। সমন্বয়ের দৃষ্টিতে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকারও। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।"[৩]

এই প্রসঙ্গ তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলছেন—"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র —কূল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না।"[৪]

ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার যেমন বরফ, আর জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর নিরাকার যেমন জল। জলও সত্য, বরফও সত্য। সুতরাং সাকার

২ কথামৃত, ৩।৪।৪
৩ ঐ ১।১।৪
৪ ঐ ১।৩।৪

ও নিরাকার দুই-ই সত্য। যেমন কথা, তেমনি উপমা। দুই-ই স্বতন্ত্র। এমন কথা এমন ভাবে এর আগে আর কেউ বলেন নি।

আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখবো সাকার এবং নিরাকার-এর দ্বন্দ্ব দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছে। যাঁরা সাকারকে সত্য বলেন তাঁরা মিথ্যা বলেন নিরাকারকে, আর যাঁরা নিরাকারকে সত্য বলেন তাঁদের মতে সাকার মিথ্যা। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ঈশ্বর বা সাকারকে বলেছেন 'মায়োপহিত চৈতন্য', মায়াচ্ছন্ন চৈতন্য, সুতরাং মিথ্যা। তাঁর মতে নিরাকার নির্গুণ চিন্মাত্র সত্য। কিন্তু, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে ঈশ্বর সাকার সগুণ বাসুদেব; শঙ্করের নিরাকার ব্রহ্ম নিছক কল্পনা মাত্র। সমন্বয়-সাধনায়-সিদ্ধ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় করেছেন। তিনি বলছেন, সাকারও সত্য, নিবাকারও সত্য।

নির্গুণ-সগুণ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, দূর থেকে দেখলে সগুণ আর একাত্ম হ'য়ে গেলে নির্গুণ। "সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছ্যাখো—রং নাই।"[৫] অত্যন্ত সহজ অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কারও বুঝতে ভুল হয় না।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "একটা নুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। সমুদ্রে যেই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক? পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। তখন আমি রূপ নুণের পুতুল সচ্চিদানন্দ রূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকেনা।"[৬]

আমাদের শাস্ত্র অধিকারভেদবাদে বিশ্বাসী। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সাধনার ক্ষেত্রে অধিকারভেদবাদ স্বীকার করতেই হয়। কারও রুচি ও প্রকৃতি ভক্তিবাদের উপযোগী, কেউ বা কর্মযোগের

৫ কথামৃত, ১।২।৪
৬ ঐ ১।৩।৪

পক্ষে উপযুক্ত আবার অন্য কারও কাছে জ্ঞানের ক্ষেত্রই স্বক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।"[৭] আরও বলেন, "নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে হবেনা। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সমস্ত ত্যাগ হ'লে—মনের লয় হ'লে—তবে অনুভবে বোধে বোধ হয়। আর অস্তিমাত্র জানা যায়।"[৮] কর্মযোগ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম চলেনা।"[৯] কর্মযোগে বিহিত নিষ্কাম কর্ম করাও সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু সকাম হ'য়ে পড়ে। হয়তো দান সদাব্রত বেশী করতে গিয়ে লোকমান্য হ'তে ইচ্ছা হ'য়ে পড়ে।"[১০] বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার তিনি বলেছেন, "কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম"। গৃহস্থ ভক্তদের কাছে এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত নির্দেশ।

বিভিন্ন যোগ-এর সমন্বয় প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি কথা বলেছেন যা অন্য আর কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক।"[১১] জ্ঞান ও ভক্তি একই জায়গায় নিয়ে যায়, একথা ত অনেকেই বলেন। কিন্তু, শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তিতে তফাৎ নেই, একথা একান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই কথা। বক্তব্যের

---

৭ কথামৃত, ৩।৯।৪
৮ ঐ ৩।৯।৪
৯ ঐ ১।২।৯
১০ ঐ ঐ
১১ ঐ ১।৭।৫

নিহিতার্থ বোধ হয় এই যে ঈশ্বরের প্রতি যাঁর শুদ্ধা ভক্তি এসেছে তাঁর কি ঈশ্বরের জ্ঞান না হ'য়ে পারে? অন্যদিকে থেকে বলা যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না হ'লে তাঁর প্রতি শুদ্ধা ভক্তি আসাও সম্ভব নয়।[১২]

'জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও আন্তরিক হ'লে ঈশ্বর পাবে', এই বক্তব্যটি বোঝাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছেন যা শ্রীরামকৃষ্ণের একান্তভাবেই নিজস্ব সম্পদ। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে উপমাটি উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন, "দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে-কোন প্রকারে এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হ'বে; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু যাও, বা কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল! একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।"[১৩] সহজ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ অথচ অব্যর্থ ভাবে বক্তব্য প্রকাশের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!

রুচি এবং ক্ষমতা অনুসারে সাধক জ্ঞান, ভক্তি বা কর্মযোগ অনুসরণ করবে, ভারতের এই সনাতন নীতি শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা স্বাতন্ত্র্যের আলোতে উজ্জ্বল। তিনি বলেছেন—"যার যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানারকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও করে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। যার যেমন রুচি।"[১৪]

---

১২ কথামৃত, ৩।১২।২
১৩ ঐ ১।১১।৪
১৪ ঐ ২.২।৩

(২)

পৃথিবীর স্বনামখ্যাত সাধকদের জীবনেতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, তাঁরা হয় দারপরিগ্রহই করেন নি, নয়ত দার পরিত্যাগ করেছেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতির জীবন এই সত্যের সাক্ষী। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মাতৃসাধনায় সিদ্ধ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীকে বর্জন না করে সাধন সঙ্গিনী করেছিলেন। আমরা একেই রামকৃষ্ণ সাধনার **দ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য** বলে মনে করি।

অনেকেরই ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন বর্জনের নির্দেশ বার বার দিয়েছেন বলে, তিনি স্ত্রী কখনও সাধন-সঙ্গিনী হ'তে পারে একথা বিশ্বাসই করতেন না। অনেকে আরও অগ্রসর হ'য়ে বলেন, আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নারীকে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে কখনও দেখেন নি। আমরা এসব মত একান্তভাবেই অসমর্থিত ও অসত্য বলে মনে করি।

একথা ভুললে চলবে না যে, সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর প্রভাব অপরিসীম। তিনি ভৈরবীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, পূজারী ছিলেন ভবতারিণী-মন্দিরের, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি ভবতারিণীকে কেন্দ্র করেই। তিনি সাধন-সঙ্গিনী করেছিলেন স্ত্রী সারদা দেবীকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" নারী শিষ্যা গৌরী দেবীকে নারী জাতির মধ্যে তাঁর ভাবধারা প্রচারের ব্রত দিয়ে বলেছেন, "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্কা।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এসব ঘটনা নারীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং তাঁর জীবনে শক্তির অপরিসীম প্রভাবই প্রমাণ করে।

অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—তবে শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী-বর্জনের নির্দেশ বার বার দিয়েছেন কেন? এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, নরের মধ্যে যেমন দু'টি সত্তার অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি, নারীর মধ্যেও এই দুই সত্তার অস্তিত্ব সমভাবে বর্তমান। এই দু'টি সত্তা

হচ্ছে—পশু সত্তা ও দেব সত্তা। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই একদিকে যেমন পশু, অন্যদিকে তেমনি দেবতা। দেহের দিক থেকে, আহার-নিদ্রা-সম্ভোগের দিক থেকে আমরা সবাই পশু। আবার যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার প্রভৃতির দিক থেকে আমরা দেব-স্বভাব। সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের পশু সত্তাকে সঙ্কুচিত করতে করতে নিঃশেষিত করে ফেলতে হয়, আর দেব সত্তাকে ক্রমশঃ বিকশিত করে পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ দিতে হয়।

নারীর মধ্যে যে পশু সত্তা রয়েছে তাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী রূপে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাধনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশ নিশ্চয়ই পালনীয়। কামিনী সত্তায় নারী পুরুষকে মোহিনী মায়ায় ভোলায়, কামনা-ক্লেদে ডোবায়, সাধনার পথ থেকে সংসারের বেদনার পথে টানে। কামিনীরূপ নারীর ভোগবতী রূপ, কিন্তু আর একটি রূপও তার আছে। নরের প্রকৃত পরিচয় যেমন তার দেবসত্তায়, নারীরও যথার্থ প্রকাশ তার ভগবতীরূপে; এইরূপে নারী কখনই বর্জনীয় নয়, গ্রহনীয়।

শিব এবং শক্তি প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলেছেন, শিব শক্তি ভিন্ন অপূর্ণ। উপমা ব্যবহার করেছেন অগ্নি ও দাহিকা শক্তির। বলেছেন, যে অগ্নির দাহিকা শক্তি নেই সে আবার কেমন অগ্নি? দাহিকা শক্তি নিয়েই অগ্নি সার্থক। ব্রহ্মও তেমনি শক্তি নিয়েই পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে বলছেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটি মানতে হয়।……সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।"[১৫]

১৫ কথামৃত, ১।২।২৪

একথা যে সাধক বলেন, তিনি ভগবতী রূপে নারীকে বর্জন করতে পারেন কি? পারেন না বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে নারীর শক্তিরূপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনীত ভাবে বরণ করেছেন। তবে যে নারী কামিনীরূপে পুরুষকে সাধনার পথ থেকে কামনার পথে নামায় সেই নরীর ছায়া মাড়ানও সাধকের পক্ষে অন্যায়, একথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই বলেছেন এবং তা সঙ্গত কারণেই বলেছেন।

নিজের স্ত্রী সারদা দেবী প্রসঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ভয় ছিল। আশঙ্কা ছিল, এ আবার তাঁকে সংসারের পথে, কামনার পথে নামাবে না ত? ভবতারিনীর কাছে এজন্য তিনি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। একদিন তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন সারদা দেবীকে—'তুমি আমাকে সংসারের পথে নামাবে না-কি?' সারদা দেবী নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন—'তা কেন? আমি তোমার সাধনার সঙ্গিনী হ'ব।' এর পর একদিন যখন সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যাঁ গা, তুমি কি আমাকে বর্জন করেছ?' শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বললেন—'না'ত, আমি ত তোমাকে গ্রহণ করেছি।'

সমস্ত ব্যাপারটিকে আমরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীর ভগবতী সত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হ'তে না পারছিলেন ততক্ষণ তাঁকে নিয়ে কত শঙ্কা, কত ভয়, কিন্তু যেই তার স্বরূপ প্রকাশিত হ'ল অমনি তাঁকে সানন্দে সাধনার পথে গ্রহণ করলেন। এতে যেন আরও বোঝা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী নারীকেই বর্জন করার পক্ষপাতী, সাধনার অনুগামিনী নারীকে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীর মধ্যে ভগবতী রূপই যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ আছে। একদিন সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদসেবা করতে করতে নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর কি ভাবেন তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'মন্দিরে যিনি

ভবতারিণী, নহবৎখানায় তিনি জননী এবং অধুনা তিনিই পদসেবা-নিরতা।' আর সকলেই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অমাবস্যা রাত্রিতে সারদাদেবীকে দেবী জ্ঞানে পুজো করেছিলেন।

সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী জেনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গ বর্জন না করে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাতের পর রাত পাশাপাশি শয্যায় শয়ন করে সাধারণ সংসারীর ভোগাসনকে কি ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগাসনে পরিণত করেছিলেন তা স্মরণীয়। এই দীব্য লীলার কথা এর আগে মানুষ কখনও শোনেনি। স্ত্রীর সঙ্গে একাসনে সাধনার কথা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই শোনা যায়। একেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার দ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য বলে মনে করি।

এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিত বামাচারী সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধনা তাঁর ভাল লাগতো না। তিনি সিদ্ধাই, পঞ্চমকার প্রভৃতি হীন বুদ্ধির কাজ বলে মনে করতেন। এ ধারণার সুস্পষ্ট উল্লেখ কথামৃত তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানভাব' প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে আর একটি কথা বলা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর ভোগাসনকে যোগাসনে পরিণত করা খুবই কঠিন কাজ। স্ত্রীকে ভোগবতীর দৃষ্টিতে না দেখে ভগবতীর দৃষ্টিতে দেখা সাধনা সাপেক্ষ ব্যাপার। সিদ্ধ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা পেরেছিলেন তা সকলের পক্ষে পারা সম্ভব বলে মনে হয় না। আসলে এপথ ক্ষুরধার দুর্গম পথ। এপথে বিপদের সম্ভাবনা প্রবল। তবে এটা অসম্ভব বা অগম্য পথ নয়।

(৩)

অনেকেরই ধারণা, গার্হস্থ জীবনের সঙ্গে ভগবৎ সাধনার বিরোধ আছে, গৃহী হ'লে যেন আর সাধক হওয়া যায় না। আমাদের দেশের

শাস্ত্রকারেরা কিন্তু একথায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা গার্হস্থ্যকে একটি আশ্রম বলে মনে করেছেন। এই আশ্রমে ধর্মাচরণের পথে মুক্তিলাভ সম্ভব, এই ছিল তাঁদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ ভারতের আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, ভারতবর্ষ গৃহীকে শিখিয়েছে 'সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।' গৃহীর নিষ্কাম কর্মের সাধনা, প্রতি কর্মে ভগবানের আদেশ পালন করে যাচ্ছি এই বোধ, তিনিই যন্ত্রী আমি সামান্য যন্ত্র মাত্র এই ধারণা গৃহীকে মুক্তির দিগন্তে নিয়ে যায়।

পুঁথিতে এসব কথা লেখা আছে দীর্ঘকাল থেকেই। কিন্তু, দৃষ্টান্তের অভাবে এই আদর্শে বিশ্বাস যেন ক্রমশঃ কমে আসছিল। এই আদর্শের সত্যতা অভ্যাসগতভাবে আমরা হয়ত মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু অন্তরের গভীরতায় এর প্রাণ-স্পন্দন আমরা যেন আর উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। এই পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় দূর করে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব।"[১৬] এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, কথামৃত-এর অমূল্য উপদেশ সবই ত গৃহী ভক্তদের লক্ষ্য করে। এই জন্যই আমরা একে রামকৃষ্ণ-সাধনার **তৃতীয় স্বাতন্ত্র্য** বলতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বরলাভ সম্ভব একথাই শুধু বলেননি, সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহীর ঈশ্বর লাভে বাহাদুরী বেশী, একথাও বলেছেন। সন্ন্যাসী সংসারে না থাকায় প্রলোভনের সম্মুখে আসেন কমই, সুতরাং তাঁর পক্ষে প্রলোভন জয় করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু, সংসারী লোক ত প্রলোভনের ঘরেই বাস করেন। তাঁর চারদিকেই প্রলোভন, কামিনী-কাঞ্চনের আকর্ষণ। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও তিনি যদি ঈশ্বরের চরণে মনটি নিত্য সমর্পিত রাখতে পারেন তবে তাঁর কৃতীত্ব কে না স্বীকার করবে?

১৬ কথামৃত, ১।৯।২

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ! যেমন কারু মাথায় দু মন বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে; মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে! খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটু পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।"[১৭]

সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাকতে গেলে সাধনা করা দরকার। এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার; তা এক বছর হোক, ছয়মাস হোক, তিন মাস হোক বা এক মাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য! ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনি আমার সর্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁকে পাব।" অর্থাৎ সংসারে থাকলেও ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা চাই, নইলে কিছু হবে না।

ভক্তিলাভের পর সংসার করে কিভাবে সার্থক হওয়া যায়, সে প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা সহযোগে এমন চমৎকার করে বলেছেন যে তার তুলনা নেই। তিনি বলেছেন—ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়! যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হ'য়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তাহ'লে জলে মিশবে না; নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসতে থাকবে।"[১৮]

নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করার উদাহরণ হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ জনক

---

১৭ কথামৃত, ১।১৫।১১
১৮ ঐ ঐ

রাজার কথা বলতেন। তিনি বলেছেন, "জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটি নাম বিদেহ ; কিনা, দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াতেন।······জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম।"[১৯]

তবে শ্রীরামকৃষ্ণ একথাও বলতেন, নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা খুব কঠিন। কালির ঘরে থাকবো অথচ গায় কালি লাগবে না, সে কি সহজ কথা! এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করা বড় কঠিন। মুখে বল্লেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁট মুণ্ড হ'য়ে উর্দ্ধপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁট মুণ্ড বা উর্দ্ধপদ হ'তে হবে না, কিন্তু সাধন চাই; নির্জনে বাস চাই। নির্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ ক'রে তবে গিয়ে সংসার করতে হয়। দই নির্জনে পাত্তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলেই দই বসে না।"[২০]

নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে নির্জন বাস এবং সাধু সঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন[২১]। যতক্ষণ বিবেক অর্থাৎ 'ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু' এই ধারণা না আসে ততক্ষণ মাঝে মাঝে নির্জন বাস একান্ত দরকার। বিবেক লাভ করার পর নির্জন বাস না করলেও চলে। উপমা দিয়ে কথাটি বোঝাচ্ছেন। বলছেন—"ফুটপাথের গাছ দেখেছ? যতদিন চারা ততদিন চার দিকে বেড়া দিতে হয়। না হয় ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলবে। গাছের গুড়ী মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নেই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না। গুড়ী যদি করে নিতে পার আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ করার চেষ্টা আগে কর। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।"[২২]

১৯ কথামৃত, ১।১৫।১১
২০ ঐ ঐ
২১ ঐ ১।৯।২
২২ ঐ ঐ

সাধুসঙ্গেও বিবেক আসে। সেজন্যই সাধুসঙ্গ করার নির্দেশ। কিন্তু, সাধু চিনবো কি করে? ভেকধারীর জ্বালায় ভক্ত চেনা ভার। ভেকে ভিখ্ মেলে, কিন্তু ভগবান মেলে না। ভেকধারী দিয়ে কি হবে? ভক্ত চাই। সাধুর লক্ষণ নির্ণয় করে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, "যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন,—যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।"[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার করে বলেছেন, গৃহস্থের সাধনার পক্ষে ভক্তি ভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদা, তাঁকেই অছি ক'রে সংসার করা, সংসার-সাগর-তরণ-এর উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি'তে পীড়িত মানুষের ব্যথায় কাতর হ'য়ে বলেছেন—"আচ্ছা, তাঁকে (ঈশ্বরকে) আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ কর্তে দিয়েছেন, তাই করো।"[২৪]

এরপর সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ কি করে করা যায় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিড়ালছানার উপমা দিয়েছেন। বলছেন, "বিড়াল ছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই। মা মা করে। মা যদি হেঁসেলে রাখে সেইখানে পড়ে থাকে। কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই ভাব। মা মা করে।"[২৫]

২৩ কথামৃত, ১।১।২
২৪ ঐ ১।১২।২৫
২৫ ঐ ঐ

গৃহস্থকে নিশ্চয়ই ভক্ত হ'তে হবে, ঈশ্বরের শরণাগত হ'তে হবে, বিবেকী হ'তে হবে এবং এজন্য মাঝে মাঝে নির্জন বাস এবং সাধুসঙ্গ করতে হবে। সংসারকে সাধনার ক্ষেত্র করতে হ'লে শুনতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের সস্নেহ উপদেশ—"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হ'য়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার, উজ্জ্বল।"[২৬]

গৃহস্থ সাধকের পক্ষে এসব অপরিহার্য হ'লেও শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহস্থের কর্তব্য কর্মে অবহেলা সম্পূর্ণ অসমর্থন করেছেন। অনেকে ভাবেন, সাধক গৃহী সংসার-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'বেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। গৃহস্থ সাধকের আদর্শ নির্লিপ্ততা, কিন্তু কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা পলায়নী বৃত্তি (escapism) নয়। সংসারী বিষয়াসক্ত বা বিষয়ী হবে না, কিন্তু সেজন্য বোকাও হবে না। আসলে গার্হস্থ ধর্ম নির্লিপ্ত, শরণাগত, কর্তব্য পরায়ণ, বুদ্ধিমান ও বীরের ধর্ম, বাসনালিপ্ত, উদ্ধত, কর্তব্যে অবহেলাপ্রিয়, বোকা ও ভীরুর ধর্ম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য গৃহস্থের কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"তোমাদের কর্তব্য আছে বৈ কি ? ছেলেদের মানুষ করা ; স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে, তোমার অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণের যোগাড় ক'রে রাখতে হ'বে। তা যদি না কর, তুমি নির্দয়। শুকদেবাদি দয়া রেখেছিলেন। দয়া যার নাই, সে মানুষই নয়।"

এই পর্যন্ত বলার পর শ্রোতা প্রশ্ন করলেন—সন্তান প্রতিপালন কত দিন ? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—"সাবালক হওয়া পর্যন্ত। পাখী

২৬ কথামৃত, ১.১১।৭

বড় হ'লে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে, তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।" শ্রোতা আবার প্রশ্ন করলেন—স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"তুমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে ধর্মোপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ করবে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্তমানে তার খাবার যোগাড় করে রাখতে হবে।" এর পর তিনি যা বলেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন—"তবে জ্ঞানোন্মাদ হ'লে আর কর্তব্য থাকে না। তখন কালকার জন্য তুমি না ভাব্‌লে ঈশ্বর ভাবেন। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী সেই নাবালকের ভার লয়…।"[২৭] অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে ভগবানই ভক্তের বোঝা বহন করেন। অবশ্য এরকম আত্মসমর্পণ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যেই নিজের ভাবনা নিজে না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন না, একথাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে সত্য।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—শ্রীরামকৃষ্ণ এসব উপদেশ ত সবাইকে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে তিনি তা অনুবর্তন করেছেন কি? আমাদের মনে হয়, তিনি তা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না। প্রচলিত অর্থে সংসার না করলেও তিনি স্ত্রীকে বর্জন করেন নি। স্ত্রীর প্রতি তাঁর কর্তব্যও তিনি বিস্মৃত হননি। সাংসারিক জীবনে সাফল্য লাভের জন্য তিনি সারদাদেবীকে 'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার কাছে যেমন সেখানে তেমন' এই নীতি শিখিয়েছিলেন। অনেকে ভাবেন, সারদাদেবীর সন্তান না হওয়ায় তাঁর নারী জীবনই ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ নারীর সার্থকতা মাতৃত্বে; এবং এই ব্যর্থতার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণই দায়ী। আমাদের এই অভিযোগ সত্য বলে মনে হয় না। সারদা দেবী নিজে একদিন এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে স্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে

২৭ কথামৃত, ১।১২।৫

বলেছিলেন, 'তোমার এত সন্তান হবে যে তুমি মা নামের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে যাবে।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একথা যে সত্য হয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সকলের কাছেই সারদা দেবী ত 'মা' নামেই পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানেরা সকলেই তাঁকে মাতৃজ্ঞানেই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। মাও তাঁদের আত্মজ সন্তানের মতই স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে নামী সন্তান বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে বলেছেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। মা সন্তানদের এতই স্নেহ করতেন যে তিনি তাঁদের সন্ন্যাস আশ্রমের নাম নিয়ে ডাকতেন না, ডাকতেন পূর্বাশ্রমের নাম নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একান্তভাবেই ভবতারিণীর শরণাগত। সেজন্য তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর ভাবনা আসলে ভবতারিণীই ভাবতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যে উপদেশ আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি সে অনুসারে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে গৃহী ভাবতেন বলেই অন্যান্য গৃহী ভক্তদের মত ভক্তিরসে আপ্লুত থাকতে ভালবাসতেন। যদিও তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে বারবারই, কিন্তু তিনি এই সমাধির কোলে দীর্ঘ শায়িত থাকতে চাইতেন না। তিনি সেজন্য তাঁর আরাধ্যা দেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন, 'আমায় রসে বশে রাখ মা।' 'চিনি হওয়া'র ভাবের চেয়ে 'চিনি খাওয়া'র ভাবের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। ভবতারিণী-মন্দিরের পূজারীর যে মাতৃসাধনা ইতিহাস-খ্যাত হয়েছে তা ত তাঁর ভক্তিভাবেরই পরিচায়ক। তিনি সদাসর্বদা ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা থাকতেন। আবার তিনিই বলেছেন, ভক্তিভাবই গৃহীর পক্ষে একান্ত উপযোগী। আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনের আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়েই গৃহীর ঈশ্বর-লাভের সাধনা কিভাবে সম্ভব তা জগৎবাসীকে দেখিয়েছেন এবং নিজের জীবনের উদাহরণের আলোকে উপদেশ দিয়েছেন—'গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব'।

মহাপ্রভু সম্পর্কে 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও সত্য বলে আমরা মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণ যা-ই বলতেন তা-ই নিজে আচরণ করতেন এবং সেজন্যই তাঁর উপদেশের সত্যতা এমন সাকার হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কথার মধ্যে এমন একটা অভিজ্ঞতার আন্তরিকতা আছে যা অন্যের অন্তরে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার সার্থকতা।

সন্দেহবাদী লোক তবু প্রশ্ন তুলবেন। তাঁরা বলবেন—শ্রীরাম-কৃষ্ণ ত সাধারণ গৃহীর মত সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন নি। সুতরাং সাধারণ সংসারীর পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করে ঈশ্বর লাভের আনন্দ পাওয়া সম্ভব কি-না, তা কে জানে! আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এ সংশয়েরও অবকাশ রাখেন নি; তাঁর সহধর্মিণী সারদা দেবীর জীবন-চর্যার মধ্য দিয়ে এ সন্দেহের সুনির্দিষ্ট সমাধান দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হওয়ার পর সারদা দেবী পাগলিনী রাধু এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে ঝামেলার সংসার দীর্ঘদিন চালিয়েছেন তা যে কোন ঝানু সংসারীর পক্ষে চালানোও খুব সহজ নয়। অথচ সারদা দেবীর জীবনে পরমাপ্রাপ্তির সুনিবিড় আনন্দের ত অবধি ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, 'ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।' আর সারদা দেবী বলেছেন, 'আমার মধ্যে কে যেন একটি শান্তির ঘট রেখে দিয়েছে।' সংসারের ঝামেলাব-ঝঞ্ঝায় অপ্রমত্ত চিত্ত, বিধাতায় বিধৃতপ্রাণ সারদা দেবী 'গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বর লাভ সম্ভব' তত্ত্বের সাকার প্রকাশ।

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ কালী মায়ের পূজারী বলেই খ্যাত। 'মা', 'মা' বলেই তদ্গত চিত্তে তিনি দিন কাটাতেন। কত মান-অভিমান, আদর-

আব্দার, শাসন-সোহাগ তিনি মা'র সঙ্গে করেছেন তার সম্পূর্ণ পরিচয় কজন রাখে! তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার সন্তান ভাব।"[২৮] তিনি আরও বলেছেন, কেঁদে কেঁদে আন্তরিকভাবে মা'কে ডাকলেই হ'ল, আর কিছু দরকার নেই। এই সাধনায় পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না, শাস্ত্র জ্ঞানও খুব প্রয়োজনীয় নয়, চিরাচরিত মন্ত্র না জানলেও চলে। তিনি বলেছেন, 'মনই মন্ত্র'। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আন্তরিকতা, সম্পূর্ণ শরণাগতি। আমাদের মনে হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে এই সাধনা অনুসরণ করা সহজ। এই সহজ সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর **চতুর্থ স্বাতন্ত্র্য** বলে মনে হয়।

সাধনার ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত সাধন-পদ্ধতির পরিচয় পাই তাতে খুঁটিনাটি এত বেশী এবং যথার্থভাবে তা অনুসরণ করা এমনই জ্ঞান-সাপেক্ষ ব্যাপার যে সাধারণের পক্ষে তা অনুসরণ করা মুসকিল। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট-সাধনায় সে সব সমস্যা নেই। এখানে 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সবই অবস্তু' এই ধারণা হ'লে ঈশ্বর লাভের আন্তরিক অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্খা থেকে 'বিড়াল ছানার মত' একান্ত মাতৃ অনুরক্তিই যথেষ্ট। এ পথ বাহ্য উপচার বহুল আচার অনুষ্ঠানের পথ নয়, এপথ আন্তরিকতার পথ এবং মানস যাত্রাই এ পথে যথার্থ যাত্রা। আরও কথা, শিশু জন্মাবার পর অনায়াসে সবচেয়ে অল্প-দিনে যে শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে তা হচ্ছে 'মা'। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা মা-ডাকার-সাধনা। সেজন্যই এ সাধনা অনায়াস লভ্য এবং সকলের পক্ষেই অনুসরণযোগ্য।

মাতৃ-সাধনা সকলের জন্যই আশার আলো তুলে ধরে। ধনী-নির্ধন, সম্পন্ন-অসম্পন্ন, পণ্ডিত-মূর্খ সমস্ত সন্তানই মার কাছে সমান আদরের। কাঁদা মাটি মেখে যে ছেলে মা'র কোলে ঝাপিয়ে পড়ে মাকি কখনও তাকে প্রত্যাখ্যান করেন? শ্রীরামকৃষ্ণ তাইত

২৮ কথামৃত, ৩।৬।২

বলেছেন—'একবার অন্তর দিয়ে মা বলে ডাক, সাড়া নিশ্চয়ই পাবি। পাপী-তাপী সকলেরই তিনি মা।' শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন, 'তিনি আমাদের পাতানো বা সতালো মা নন, সত্যিকারের মা।' এই সত্যিকারের মা'র কাছে লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই, ঘৃণাও নেই। যখনই শরণ নেওয়া যাবে তখনই তিনি আশ্রয় দেবেন। তাঁর আশ্রয়ে রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা কিছুই থাকেনা, বরং তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি অন্তরে শান্তি আনে, পরমা তৃপ্তির আস্বাদন আনে মনে, হাতের বরাভয় স্পর্শে দেহ-প্রাণ-মন সবই জুড়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই সকলের জন্যই দিব্য আনন্দের প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছেন। তাঁর আরাধ্যা জননীর মতই তিনি সবাইকেই স্থান দিতে প্রস্তুত। নানাভাবে কলঙ্কিত জীবন যারা যাপন করেছে তারাও শ্রীরাম-কৃষ্ণের শরণ নিলে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবীর স্বামী প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য খুব মনে পড়ে। তিনি বলছেন সন্তানদের—'ঠাকুর কি শুধুই রসগোল্লা খেতে এসেছেন?' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বক্তব্যের নিহিতার্থ এই, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ধর্মপ্রাণ, সুবোধ, সুশীল সন্তানদের আশ্রয় দিয়েছেন, তেমনই আশ্রয় দিয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল, অবোধ, দুঃশীল সন্তানদের; তিনি ভালোও নিয়েছেন আবার খারাপও নিয়েছেন। অখণ্ডের ঘরের নিরুপম নরেন যেমন তাঁর সন্তান, তেমনি নানা দুরাচারে দুরন্ত গিরীশও তাঁর সন্তান। মায়ের দৃষ্টিতে সন্তানে সন্তানে ভেদ কি? এতে সংসারের ক্লেদে ক্লিন্ন নর-নারীর পক্ষে আশার ও আশ্বাসের কথা আছে। এই আশা ও আশ্বাসের কথা নিরাশ মানুষকে যে সাধক শুনিয়েছেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করবে কে?

(৫)

অনেকে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধরণের সান্ত্বনা ও শরণরূপে এক রক্ত-মাংসের মা'কে উপহার দিয়ে গেছেন। তাঁরা সারদা দেবীর কথা বলছেন। যে সারদাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্না বলে মনে করেছেন, ষোড়শীরূপে পুজো করেছেন তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় বৈকি। বিশ্বেশ্বরী মা'কে সাধারণ লোক ত চোখে দেখে না। তাঁর স্নেহ-প্রেমের পরিচয় সাধারণ লোক পাবে কি করে? তাঁর কাছে আশ্রয়ই বা নেবে কি ভাবে? সেজন্যই করুণাঘন ও কৃপাপ্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বেশ্বরীর স্নেহ-প্রেম ও নিরাপদ আশ্রয় তাঁর সহধর্মিণী সারদেশ্বরীর মধ্যদিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থিত করেছেন। সাধারণ লোক বিশ্বেশ্বরীকে সারদেশ্বরীরূপে পেয়ে তাঁর স্নেহে, তাঁর সযত্ন লালনে এবং নির্ভয় আশ্রয়ে নিজেদের ধন্য করেছে। সেজন্যই ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিজ্ঞ বীর বিবেকানন্দ সারদাদেবীকে বলেছেন, 'জ্যান্ত তুর্গা'। জগজ্জননী জীবন্ত হয়ে এসেছেন সারদারূপে। কত পণ্ডিত, কত মুর্খ, কত সম্পন্ন, কত অসম্পন্ন, কত সদাচারী যে এই মায়ের চরণে ঠাঁই পেয়ে সংসার-জ্বালা জুড়িয়েছে তার হিসেব নেই। 'মায়ের কথা' বইতে মায়ের অপরিসীম প্রেম, সন্তান বাৎসল্য এবং নির্বিচারে স্নেহ বিতরণের যে সব কাহিনী আছে তা পড়লেই আমরা বুঝি এ মা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত আশা-আশ্বাস ও আশ্রয়দাত্রী সকলেরই মা। এই মা হাসি মুখে সকলের যন্ত্রণা সহ্য করেন, কাউকে প্রত্যাখ্যান করেন না, সবাইকে স্নেহাঙ্কে আশ্রয় দিয়ে অভয়দান করে পরিতৃপ্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এ মা পাতানো বা সতালো মা নয়, সত্যিকারের মা। আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-কল্পনা এইভাবে সারদাদেবীর মধ্যে রূপ পেয়ে সাধারণের কল্যাণ, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি বিধান করে সার্থকতা লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বেশ্বরীর রক্ত মাংসের প্রকাশের মধ্য

দিয়ে সাধারণ লোককে নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশা ও আশ্বাসের আলো দেখিয়ে সাধকদের মধ্যে **স্বাতন্ত্র্য** অর্জন করেছেন। অন্য কোন সাধক সাধনার ধনকে এমন রক্ত-মাংসের মানবীরূপে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতৃসাধনা

(১)

বাংলাদেশ সজল পলিমাটির দেশ। সেজন্য এদেশের মাটি খুবই সরস ও কোমল। এই মাটিতে যে সব মানুষ জন্মে তাদের মনও মাটির এসব গুণ পায়। মাটির সঙ্গে মনের সোদর সম্পর্ক ত সবাই স্বীকার করেন। বাঙ্গালীর হৃদয়সম্পদ, প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-স্নিগ্ধ চিত্ত বাংলার পলিমাটির দান। বাংলার মাটির জন্যই ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালী জীবনের বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠেছে।

একটি বিশেষ দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি সে দেশের মানুষের মনের বিশেষ আদলটি প্রকাশ করে। বাংলার সাধনা ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও হৃদয়সম্পদ-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। সেজন্যই লক্ষ্যনীয়, বাঙ্গালীর দু'টি বিশিষ্ট সাধনা—বাংলার বৈষ্ণব-সাধনা ও মাতৃ-সাধনা—সহৃদয় রস-স্নিগ্ধ সাধনা।

বাংলার বৈষ্ণব-সাধনার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। সাধারণতঃ দেবতাকে আমাদের মত সসীম মানুষ থেকে বহুদূরবাসী অসীম গগন বিহারী বলে মনে করা হয়। কিন্তু, বাংলার বৈষ্ণবেরা তা মনে করেন না। তাঁরা বলেন, দেবতা আমাদের দূরের কেউ নন, খুবই কাছের একান্ত আপনার জন। পারিবারিক বিভিন্ন প্রিয় সম্পর্কের মধ্যে তাঁরা দেবতার প্রকাশ দেখেন। কখনও সখা রূপে, কখনও সন্তান রূপে, কখনও প্রভু রূপে, কখনও বা পরম কান্ত রূপে তাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করেন। তাই বলা হয়, বাংলার বৈষ্ণবেরা দেবতাকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং প্রিয়কে করে তুলেছেন দেবতা। এই দেবতা-

তত্ত্বের মধ্যে মানুষের হৃদয় বৃত্তিরই যে প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে তা বিস্তারিত করে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে বাংলার বৈষ্ণবদের দেবতা-তত্ত্ব আসলে প্রিয়-তত্ত্ব এবং প্রিয়-তত্ত্ব কখনই মানুষের প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তির মাধ্যমে ছাড়া বোঝা যায় না।

এই প্রিয়-দেবতাকে পেতে হ'লে বৈষ্ণবদের মতে প্রেমের গভীরতার মধ্যেই পেতে হবে। সেজন্যই বলা হয়, বৈষ্ণবদের সাধন-তত্ত্ব সুগভীর প্রেম-তত্ত্ব বিশেষ। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-সাধক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবতার নামেই খ্যাত। প্রেম-বন্যায় তিনি দেশ ভাসিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'প্রেমে শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়।' প্রেম-প্রাপ্তি ও প্রেম-নিবেদনের আকুলতা মহাপ্রভুর মধ্যে এমনই প্রবল ছিল যে আঘাত পেয়েও তিনি বলেছেন—'মেরেছিস মেরেছিস কলসীর কাণা তা বলে কি প্রেম দেব না?' বাংলার বৈষ্ণবদের প্রিয়-দেবতা-তত্ত্বের মতই প্রেম-সাধন তত্ত্বেও হৃদয়েরই প্রকাশ এবং এতে বাংলার সজল, সরস মাটির প্রভাবই প্রকট।

বাঙ্গালীর মাতৃ-সাধনা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-সাধনা থেকে ভিন্ন। কিন্তু, এরা ভিন্ন হ'লেও এদের মূল প্রেরণা ও ভিত্তি এক বলেই মনে হয়। আরাধ্যকে আপনার করার প্রেরণা উভয় সাধনাতেই বর্তমান। উভয়েরই ভিত্তি—হৃদয়ের ভাব ও ব্যাকুলতা, মনন-সর্বস্বতা নয়। অবশ্য সাধারণতঃ লোকেরা মাতৃসাধনা বা শক্তি সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনার বিরোধ কল্পনা করেন। কিন্তু, বাংলার মাতৃসাধনায় সিদ্ধ দু'ই সাধক রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ এই বিরোধ স্বীকার করেন নি। আমরা এই প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করবো।

বাঙ্গালীর মাতৃসাধনা দু'টি খাতে প্রবাহিত—একটি হচ্ছে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে বিশ্বমাতা 'উমা বা দুর্গা-সাধনা', আর একটি হচ্ছে 'কালী-

সাধনা'। দুর্গা-পূজা বাঙ্গালীর ঘরে যেমন করে হয় ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসীর ঘরেই তেমন করে হয় না। আগমনী গানের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী মেয়ে-মা উমা সম্পর্কে যে প্রেম-প্রীতি, আদর-সোহাগ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে তা একমাত্র পলিমাটির দেশের হৃদয়-সম্পদে সম্পন্ন বাঙ্গালীর পক্ষেই সম্ভব। ভাবের কতটা গভীরতা থাকলে বিশ্বের মাকে ঘরের মেয়ে করে তোলা যায় তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হ'বে, লিখে বোঝান যাবে না।

বাঙ্গালীর মাতৃসাধনার দ্বিতীয় ধারা—'কালী-সাধনা'। বাঙ্গালীরা চরম আরাধ্যাকে 'মা' বলে ডেকেছেন। এই মা দুর্গাও বটেন, কালীও বটেন। আসলে কেউ তাঁকে বলেন দুর্গা, আর কেউ বলেন কালী। এই মাতৃসাধনা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেখা গেলেও বাংলাদেশে এর যেমন প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা অন্য কোন প্রদেশেই তেমন নয়। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলেছেন, 'বাঙ্গালী যেমন করে মা ডাকতে পেরেছে তেমন আর কেউ পারেনি', একথা সত্য বলে মনে হয়।

আমাদের ধারণা, মানুষের অন্তরে যত প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা আছে তার ঘনীভূত রূপ 'মা' শব্দটি। মা'র বিশিষ্ট সম্পদ তাঁর হৃদয় সম্পদ। মার সঙ্গে সন্তানের যোগাযোগ হৃদয়ের যোগাযোগ। বাঙ্গালী মাতৃ-সাধনায় তার শুদ্ধ হৃদয় বৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছে। পলিমাটির দেশের লোকের পক্ষে এটাই সহজ ও স্বাভাবিক।

অবশ্য যে সমস্ত ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকায় সাধনার প্রকৃতি-নির্ণয়ের পক্ষপাতী তাঁরা বলবেন, আর্যেরা ছিলেন পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজের লোক; অর্থাৎ আর্য সমাজে পিতাই প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং সেজন্যই আর্যদের অধিকাংশ দেবতাই পুরুষ। অনার্যেরা ছিলেন মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের অধিবাসী, সেজন্যই তাঁরা মাতৃদেবতার পূজারী। আরও কথা, আর্যদের মধ্যে দেবতার প্রীতি

উৎপাদনের জন্য যাগযজ্ঞ করার রীতি ছিল, কিন্তু ফুল দিয়ে পূজো করার পদ্ধতি তাঁদের জানা ছিল না। পূজো পদ্ধতি একান্তভাবেই অনার্য্য পদ্ধতি।[১] বাংলা দেশ আর্য অধ্যুসিত দেশ ছিল না। এখানে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব সেজন্যই এত প্রবল। বাঙ্গালীর মাতৃপূজা আসলে অনার্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের মাতৃ-দেবতা পূজার ঐতিহ্য প্রকাশ করে।

মনীষী ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মাতৃদেবতার পূজা পদ্ধতি যে অনার্য দ্রবিড় সভ্যতার অবদান, একথা জোর দিয়ে বলেছেন।[২] এই প্রসঙ্গে এস. কে. দিক্ষিত বলেন, ব্যাবিলন-ভাষায় মা-এর প্রতিশব্দ উম্মু বা উম্মা (উমা), দ্রবিড় ভাষায় আম্মা এবং এ সমস্তই মাতৃদেবীর স্মারক।[৩] মহেঞ্জো-দাড়ো এবং হরপ্পা খনন করে মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে বলে মাতৃপূজা যে অনার্যযুগে প্রচলিত ছিল, একথা নিঃসন্দেহে জানা যায়।[৪] মার্শাল-এর মতে মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পায় প্রচলিত মাতৃপূজা থেকেই পারবর্তীকালের শাক্তসাধনার উদ্ভব হয়েছে।[৫] তিনি আরও বলেন, শাক্ত সাধনায় শিব ও শক্তির ধারণা সাধারণ নর-নারীর যৌন জীবনের ধারণা থেকেই এসেছে। বার্থও এই মতেরই সমর্থক। লৌকিক জীবনে নারীপুরুষের মিলনে সন্তানলাভের ধারণার ভিত্তিতেই বিশ্ব-সৃষ্টি প্রসঙ্গে শিব ও শক্তির ধারণা পাওয়া গেছে, এই তাঁর মত।[৬]

অনেক মনীষীরই মতে শাক্ত সাধনায় শিব ও শক্তির ধারণা সাংখ্য দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতিরই নবরূপায়ণ। সাংখ্যের পুরুষ

১ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত Indo Aryan and Hindi গ্রন্থের ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ The Vedic Age, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

৩ The Mother Goddess, ৫৯ পৃষ্ঠা।

৪ Marshall : Mohenjodaro and the Indus Civilization, প্রথম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা।

৫ তৎবৎ : ৫৭ পৃষ্ঠা।

৬ Barth : Religion of India, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

শাক্তদের শিব এবং সাংখ্যের প্রকৃতি শাক্তমতে শক্তি। বহু পণ্ডিতের মতে সাংখ্য মত প্রাকবৈদিক যুগের অবদান। গার্বে বলেছেন, সাংখ্য মতের উৎস প্রাকবৈদিক যুগে নিহিত। প্রথম অবস্থায় সাংখ্য একান্তভাবেই অবৈদিক পর্যায়ভুক্ত ছিল। জিম্মার (Gimmer) বলেন, সাংখ্য যে প্রাকবৈদিক যুগের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৭] বাঙ্গালী মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই মতই সমর্থন করেছেন।[৮] অনেকের ধারণা, স্বয়ং শঙ্করাচার্য শারীরিক ভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য মতকে অবৈদিক মত বলে উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, সাংখ্য মত শ্রুতির তাৎপর্য যথার্থভাবে প্রকাশ করে নি, সাংখ্য প্রাকবৈদিক বা অনার্য চিন্তার ফল এমন কথা শঙ্কর কোথায়ও বলেন নি এবং একথা তাঁর অভিপ্রেতও নয়। আরও কথা, শঙ্করাচার্য সাংখ্য মতের উৎস নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি সাংখ্য তত্ত্বের দার্শনিক আলোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত করেছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে কোন মতের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা কখনই প্রাধান্য পায়না, কোন মতের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বিচারই মুখ্যস্থান অধিকার করে। এজন্যই দার্শনিক শঙ্করাচার্য সাংখ্যের তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, ইতিহাস নিয়ে বিব্রত হননি।

আবার অনেকে বলেন, আদীম মাতৃদেবী হ'লেন পৃথিবী দেবী। এই পৃথিবী দেবীর কথা ঋক সংহিতায় পাওয়া যায়। অবশ্য পিতা 'দ্যৌ'র সঙ্গে মাতা'পৃথিবী' বৈদিক সাহিত্যে একত্র স্তুতা হয়েছেন। বৈদিক ঋষিরা মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—'মাতা পৃথিবী মহীয়ং'—বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমার মাতা (১।১৬৪।৩৩)। বহু সূক্তে পিতা 'দ্যৌ'র সঙ্গে মাতা 'পৃথিবী'র কাছে প্রচুর শস্য, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, শৌর্য-বীর্য, সুখ-

---

৭ Philosophies of India, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৮ বৌদ্ধধর্ম, ৩৭ পৃষ্ঠা।

শান্তি, সন্তান ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা হয়েছে। আবার অনেক সূক্তে বলা হয়েছে, 'দ্যৌ' পিতার বর্ষণ (বর্ষা) হচ্ছে রেতঃ, সেই বর্ষণেই মাতা পৃথিবী গর্ভধারিণী হয়ে শস্যশালিনী হন। লক্ষনীয় এই, পিতা ও মাতা হিসেবে বেদে যে দ্যৌ ও পৃথিবীর কল্পনা করা হয়েছে তাই পরবর্তী কালে বিবর্তিত হ'য়ে সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়।

আমাদের ধারণা, বৈষ্ণব সাধনায় কৃষ্ণ-রাধা এবং শাক্ত সাধনায় শিব ও শক্তি আসলে বেদের দ্যৌ ও পৃথিবী এবং সাংখ্য দর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ বৈদিক ঋষিরা সহজ অনুভূতির মধ্যে যা দ্যৌ ও পৃথিবীরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, সাংখ্যকার তা-ই যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব রূপে পরিবেশন করেছেন এবং তা-ই পরবর্তীকালের বিভিন্ন সাধকদের কাছে কখনও শিব ও শক্তিরূপে কখনও বা কৃষ্ণ ও রাধারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এই বিবর্তনের ধারা দীর্ঘকাল ধরে যে প্রবাহিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। শস্য-সম্বৃতা পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে কল্পনা শুধু প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যেই সীমিত ছিল না। অন্যান্য বিভিন্ন দেশেও এর প্রকাশ ও প্রচার লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন গ্রীক মাতৃদেবী 'রহী' (Rhea) নিঃসন্দেহে পৃথিবী-দেবী, রোমান দেবী সিবিলিও (Cybele) মুখ্যতঃ তাই। প্রাচীন মেক্সিকোর মাতৃদেবী যদিও মূলতঃ চন্দ্রদেবী, তবু তিনি পৃথিবী দেবীও ছিলেন। তাঁকে প্রায়ই সম্বোধন করা হ'ত 'Telalli Telalli' বলে এবং এর অর্থ 'পৃথিবীর মর্ম'। ট্যাসিটাস্ বলেছেন, 'Nearly all the Germans unite in worshipping Nerthus, that is to say, Mother Earth,' প্রায় সমস্ত জার্মানরাই যে নের্থাস দেবীর পূজোয় সমবেত হতেন তিনি ছিলেন পৃথিবী দেবী।

শস্য-সমাবৃতা পৃথিবীকে মাতৃদেবী রূপে পূজো করার এই ঐতিহ্য বাঙ্গালীর মাতৃসাধনায় এক বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্গালীর কাছে মা শুধু মেনকার মেয়ে উমা বা শ্যামা মা নন, তিনি দেশ মাতাও। শস্যশালিনী জননী বঙ্গভূমিকে বাঙ্গালীরা শুধু মাটি বলে দেখেনি 'মা'-টি বলে জেনেছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় 'জননী ভারতভূমি' কথাটি প্রথম পাওয়া যায়। তবে এখানে দেশের মাতৃমূর্তি তেমন স্পষ্ট বা গভীর নয়। দেশের মাতৃমূর্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও গভীর দ্যোতনা নিয়ে প্রথম প্রকাশ পায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে, বিশেষ করে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে এবং গানে। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিটি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে জাগরণ, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এবং আদর্শের জন্য জীবনদানের অভয় মন্ত্রের কাজ করেছে। এই গানটির সমগ্র রূপটি তিনটি উপাদানে গঠিত বলে মনে হয়। প্রথম অংশটি—'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং' বলে বঙ্গদেশের বর্ণণা প্রকাশ করেছে, দ্বিতীয় অংশ—'সপ্তকোটি কণ্ঠ' প্রভৃতিতে দেশ বলতে যে দেশবাসী বোঝায় তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় বা সর্বশেষ অংশে 'ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণধারিনী' বলে দেশ মাতাকে জগন্মাতা দুর্গারূপে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র মাটির দেশ, দেশবাসী এবং জগজ্জননী দুর্গা শেষ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আনন্দমঠে 'মা যাহা ছিলেন, মা যাহা আছেন এবং মা যাহা হইবেন' বলে যে দেশ জননীর ত্রিমূর্তি দেখান হয়েছে তা ত জগদ্ধাত্রী, কালী এবং দুর্গার মূর্তি। অর্থাৎ দেশ জননী আর জগজ্জননী এক, এই সিদ্ধান্তে বঙ্কিমচন্দ্র অচল ও অনড় ছিলেন। এই বক্তব্যের মধ্যে পৃথিবীকে মাতৃদেবী রূপে কল্পনা করার আদি প্রবণতার প্রভাব সুস্পষ্ট।

দেশের এই দেবীরূপের পরিচয় শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন—"Mother India

is not a piece of earth ; she is power, a Godhead, for all nations have such a Devi supporting their separate existence and keeping it in being."[১] ভারতজননী একটি মৃত্তিকা খণ্ড মাত্র ন'ন, তিনি শক্তি ও দেবী। শ্রীঅরবিন্দ সেজন্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মাতারই সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেবী দুর্গার কাছে এই মাতৃ সংগ্রামে জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করে বলেছেন—"Mother Durga! Giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self of might, Mother beautiful and fierce. In the battle of life, in India's battle, we are warriors commissioned by thee ; Mother, give to our heart and mind a titan's strength, a titan's energy, to our soul and intelligence a god's character and knowledge." কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও মুকুন্দ দাস-এর লেখায় দেশ মাতৃকার দেবী কল্পনা সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গানেও এই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক,—
... ...
বিশকোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশকোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক্ সুখে ভাসিবে ॥

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই কবিতাটি প্রসঙ্গে বলেছেন—"ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে' প্রভৃতির

১ Sri Aurobindo and the Mother.

প্রতিধ্বনি একেবারে অস্পষ্ট নয় ; অন্ততঃ ইহা যে সম-ঐতিহ্যের প্রভাব হইতে জাত তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আর একটি গানে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে দেশজননীর পশ্চাতে জগজ্জননীর প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলছেন—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী ?
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে।

'সোনার মন্দিরে'র এই জননীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।

এই খড়্গধারিনী, শঙ্কাহরণী অগ্নি বর্ণের ললাট-নয়নী কি পৌরাণিক দুর্গারই নবরূপায়ণ নয় ?

এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় এই যে, মাতৃসাধনায় সিদ্ধ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিপ্লবী-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই বলেছেন—'ভুলিওনা ভারতবাসী, তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।' এই প্রসঙ্গে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই, বাংলাদেশের মাটি মাতৃ-সাধনার অনুকূল এবং এই মাতৃ-সাধনা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, ভাবের দৃষ্টিতে এবং প্রেমিকের দৃষ্টিতে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছে।

(২)

দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাতৃ-সাধনার জন্য খ্যাত। কিন্তু, লক্ষ্যনীয় এই, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-সাধনা বা শক্তি-সাধনা সচরাচর প্রচলিত মাতৃ-সাধনা বা শক্তি সাধনা নয়। সাধারণতঃ শক্তি সাধনায় একটি সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। রামপ্রসাদের আবির্ভাবের পূর্বে শক্তি-সাধনা গুহ্য সাধনার নামান্তর ছিল এবং এই সাধনায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব অত্যন্ত প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সাধনায় কতকগুলো বাহ্য আচার-আচরণ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল এবং এই সাধনার অনুগামীরা বৈষ্ণব-ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় একশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হ'য়ে সর্বপ্রথম সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে কালী-সাধনাকে একটি সার্বজনীন উচ্চস্তরের মানস-সাধনায় রূপান্তরিত করেন। রামপ্রসাদের কালী-সাধনায় আমরা অন্য কোন সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ বা বিদ্বেষ লক্ষ্য করি না, এখানে সাধনার 'বহিরঙ্গের' ওপর গুরুত্ব না দিয়ে 'অন্তরঙ্গের' ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আচার-আচরণ মুখ্যস্থান অধিকার না করে এই সাধনায় প্রাধান্য পেয়েছে আন্তরিকতা ও তন্ময়তা। আমাদের ধারণা, বাংলার শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ যে নূতন উদার মনোভাবের সঞ্চার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে এক নূতন ব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য সাধক রামপ্রসাদের সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিতি আবশ্যক।

রামপ্রসাদের ধ্যান-ধারণা ও সাধন-পদ্ধতির যে পরিচয় আমরা পাই তা মুখ্যতঃ তাঁর নামে প্রচলিত বিভিন্ন সঙ্গীতের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত'-এর স্বাদগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন 'শ্রীম'। কিন্তু, রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে এমন কোন 'শ্রীম'র কথা শোনা যায়

না। সেজন্য সাধক রামপ্রসাদের সাধনার পরিচিতি পেতে হ'লে তাঁর সঙ্গীতের ওপরই নির্ভর করতে হ'বে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, রামপ্রসাদ ভাব বিহ্বল হ'য়ে প্রাণের আনন্দে গান করতেন, কোন লোককে শুনিয়ে খুশী করবার জন্য তিনি গান করতেন না। অন্তরের ভাব-প্রাচুর্য স্বরের সুরধনী হ'য়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। সেজন্য এই সুরে যেমন একটা প্রাণ মাতানো আন্তরিক আবেদন আছে তেমনি বক্তব্যের মধ্যে একটা গভীর তাত্ত্বিক তাৎপর্যও আছে।

আমরা সাধারণতঃ কালী-সাধনা বলতে শ্মশানে শব সাধনা, ভৈরবী চক্র-সাধনা প্রভৃতি আচরণ নির্ভর যে তন্ত্র সাধনা বুঝি রাম-প্রসাদ সে সাধনা করেন নি। তাঁর সাধনা, ভাবের সাধনা, অন্তরের সাধনা। কোন সিদ্ধাই প্রদর্শন এই সাধনার অঙ্গ নয়। তান্ত্রিকদের মধ্যে কারণ-বারি নামে সুরাপানের যে রীতি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে রামপ্রসাদ তা বস্তুগত দিক থেকে গ্রহণ না করে ভাবগত দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয় রামপ্রসাদী গান—

ওরে সুরা পান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।

মদ-মাতাল-এর চেয়ে মন মাতাল হওয়াই প্রসাদ-সাধনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। শুধু তাই নয়। সাধনাকে তিনি ভাবের বিষয় মনে করেছেন। সেজন্যই বলেছেন, ভাবের জিনিস কখনই বাইরের বস্তু দিয়ে পাওয়া যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর গানের কলি—'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অ-ভাবে কি ধরতে পারে।'

রামপ্রসাদ নিঃসন্দেহে মাতৃসাধক, মায়ের সন্তান। সর্বভূতে যিনি মাতৃরূপে সংস্থিতা তাঁকেই তিনি প্রাণ দিয়ে ডেকেছেন, দেখা পেয়েছেন মা ও মেয়ে-রূপে। আমরা পূর্বে বলেছি, সাধারণ শাক্ত-

সাধনার ভিত্তি 'শিব ও শক্তি'র দ্বৈত বোধ এবং এই বোধ মুখ্যতঃ সাংখ্য দর্শন-স্বীকৃত 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র দ্বৈতধারণা থেকে এসেছে। পরবর্তীকালে বেদান্ত দর্শনে সাংখ্য-স্বীকৃত 'পুরুষ ও প্রকৃতি'র দ্বৈতবোধ 'ব্রহ্ম' ও তাঁর 'শক্তি'র অভেদ তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। বেদান্তীরা বলেছেন, অগ্নি ও তাঁর দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তিও তেমনি অভিন্ন। দাহিকা শক্তি না থাকলে অগ্নি অগ্নিই হ'তে পারে না, তেমনি শক্তি ভিন্ন ব্রহ্ম অপূর্ণ, অসার্থক। বেদান্ত দর্শন যেমন সাংখ্য দর্শনের পরিণতি, তেমনি বোধ হয় শিব-শক্তির দ্বৈত ধারনা-ভিত্তিক সাধারণতঃ প্রচলিত শাক্ত-সাধনারও পরিণতি ব্রহ্ম-শক্তি-অভেদ-তত্ত্ব-ভিত্তিক উচ্চতর শাক্ত-সাধনায় বা বেদান্ত-সাধনায়। কথাটা অন্যভাবে বলা যায় যে, শাক্ত-সাধনার একটা পরিণত রূপ এমন হ'তে পারে যে তা বেদান্ত-সাধনার সঙ্গে অনেকাংশে অভিন্ন। কথাটা যে শুধু তাত্ত্বিক ভাবেই সত্য নয়, বস্তুতঃ ও সত্য, তার প্রমাণ সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই কালী ও ব্রহ্ম যে এক, একথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা এখন রাপ্রসাদের কথাই বলছি, পরে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও বলবো। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

> সোহাগা গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরায়েছি।
> মণি-মন্দিরে মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
> প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
> এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি॥

গানের শেষাংশটিই আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। রামপ্রসাদ বলছেন, 'এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।' শ্যামাই যে ব্রহ্ম, এ বিষয়ে রামপ্রসাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের আর একটি গান আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সাধক বলছেন—

হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, 'তারা' বলে হ'ব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, 'তারা' আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা ॥

প্রচলিত কালী-সাধনা সাকার উপাসনা বলেই পরিচিত। কিন্তু, যিনি কালী বা শ্যামাকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করেছেন তাঁর কাছে কালী বা শ্যামা নিরাকারা। সেজন্যই 'শ্যমা-ব্রহ্ম'-র সাধক রামপ্রসাদ তারাকে নিরাকারা বলেছেন। কথাটা হ'চ্ছে এই, যা-ই সাকার তা-ই নিরাকার, দেখতে জানলেই হ'ল।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। শ্যামাকেই যিনি ব্রহ্ম বলে জেনেছেন সেই সাধক রামপ্রসাদ বলেন 'মা বিরাজে সর্ব ঘটে'। এখানে শাক্ত-দৃষ্টি এবং ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক দৃষ্টির অভিন্নতা সূচিত হয়েছে। চরম তত্ত্ব ও চরম সত্য ব্রহ্মও বটেন, ব্রহ্মময়ীও বটেন এবং শেষ পর্যন্ত দু'য়ে এক বা অভেদ।

প্রাক-রামপ্রসাদের কালে গুহ্য-সাধনা নামে শাক্ত-সাধনা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দ্বারা খণ্ডিত ছিল। শাক্ত-সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব-সাধনার বিরোধ তখন বিশেষভাবে প্রচার করা হ'ত। একথা আগেই বলেছি। রামপ্রসাদের উদার অভেদ দৃষ্টিতে এই বিরোধ সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা বলে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি ধ্যানের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সবই এক ও অভিন্ন। তিনি গেয়েছেন—

ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি।

এইভাবে রামপ্রসাদের শক্তি-সাধনা সমস্ত রকমের সাম্প্রদারিক ধর্ম-সাধনার ঊর্ধ্বে এক উদার সার্বজনীন ব্রহ্মোপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। এই উপলব্ধির জন্য কালীকে অবলম্বন করেই সাধক রামপ্রসাদ দোল-লীলার আস্বাদন করতে পেরেছেন। সাধারণতঃ দোল কৃষ্ণলীলা বলেই স্বীকৃত ও প্রচারিত। আরও লক্ষ্যনীয়, রামপ্রসাদ দোল-লীলাকে কোন বাহ্যিক অনুষ্ঠান বলে মনে করেন নি, তিনি একে আন্তরলীলা বলে উপলব্ধি করেছেন। মাতৃসাধকের পক্ষে শ্যামের বদলে শ্যামা দোললীলার কেন্দ্রদেবতা, হৃৎ-কমল-মঞ্চ (অনাহত চক্র বা পদ্ম) দোলমঞ্চ, বামদিকে ইড়া এবং দক্ষিণদিকে পিঙ্গলা মঞ্চের দুপাশের দু'টি দড়ি, সুষুম্না মাঝখানের দড়ি। এভাবেই শ্যামা মা দোললীলায় দোলেন। সাধক গেয়েছেন—

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ও মা ॥

যে রামপ্রসাদ তারাকে নিরাকারা বলেছেন তিনি কিন্তু কালীর প্রতিমাপুজোর বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু, প্রতিমা যে ব্রহ্মময়ীর প্রতীকমাত্র একথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি না করলে প্রতিমা-পুজো ব্যর্থ হয়, বলেছেন রামপ্রসাদ। বক্তব্য এই, নিরাকার তারাকে ধারণা করার সুবিধের জন্য আমরা তাঁকে প্রতিমার মধ্যে সাকার রূপে প্রতিষ্ঠা করি। একথা বিস্মৃত হ'লে মাটির প্রতিমা মা-টি না হ'য়ে শুধু মাটিই থেকে যায় আর ব্যর্থ হয় সমস্ত উদ্যোগ-উপচার, আয়োজন-অনুষ্ঠান। রামপ্রসাদ তাই গেয়েছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥

রামপ্রসাদ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান-নির্ভর মূর্তি পুজোর বিরোধী না

হ'লেও সমস্ত রকমের বাহুল্যবর্জিত মানস-পুজোরই বেশী পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন, 'তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে নারে জগজ্জনে।' সে পুজোর রীতি-নীতি সাধারণ পুজো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'বে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে' এবং 'ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্তি কর আপন মনে'।

মায়ের পুজো রামপ্রসাদের মতে কোন বিশেষ ক্ষণের বিশেষ পুজো নয়, এ সমস্ত জীবনের সমস্ত ক্ষণের স্বাভাবিক অনুরক্তি ও একান্ত আত্মসমর্পণ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

শোনরে মন তোরে বলি, ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধ'রে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে॥

পুজোর ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির অসারতা রামপ্রসাদ এত গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি তীর্থ-ভ্রমণ প্রভৃতি সাধনার পথে 'মিথ্যা ভ্রমণ' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক গানটি এই—

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে।
ও মন, ত্রিবেনীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হ'বে অন্তঃপুরে॥

রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ী আর ব্রহ্ম অভেদ এবং তারা নিরাকারা জেনেও অদ্বৈতবাদ-সমর্থিত নির্বিকল্প সমাধির জ্ঞান-গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে চাননি। শ্যামা মায়ের সন্তানরূপে তাঁর স্নেহ-রস

বা ভক্তি-রস-এর বিচিত্র আস্বাদন পেতে চেয়েছেন। অদ্বৈত সত্য জেনেও লীলা-রস আস্বাদনের জন্য দ্বৈতের ভান তাঁর প্রিয় ছিল। তাই তিনি গেয়েছেন—

নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

জ্ঞানের পথে জলে জল হয়ে মিশে যাওয়ার চেয়ে, চিনি হয়ে যাওয়ার চেয়ে, জলের স্বাদ গ্রহণ করা, চিনি খাওয়াকে তিনি অধিকতর কাম্য বলে মনে করেছেন। নিত্যকালের ভক্তের ভক্তি সুধা-আস্বাদানের এটাই চিরন্তন লীলা বিলাস।

রামপ্রসাদ শ্যামা মা'কে গর্ভধারিণী মা'র মতই আপনার জেনে তাঁর কাছে অভিমান-অভিযোগ, আনন্দ-আহ্লাদ, আবদার-হাহাকার সবই নিবেদন করেছেন অকপটে ও অসঙ্কোচে। জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে ঘরোয়া মা'র সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তানভাবে তাঁর স্নেহ-সুধা পান করে ধন্য হয়েছেন তিনি। অসীম ও নিরাকারকে সসীম ও সাকাররূপে দর্শন ও তাঁর অপরিসীম করুণার বিচিত্র আস্বাদন রামপ্রসাদের সাধক জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

(৩)

আমরা পূর্বেই বলেছি, সাধক রামপ্রসাদ সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্দ্ধে মাতৃসাধনা বা কালী-সাধনাকে একটি সার্বজনীন উদার মানস-সাধনায় পরিণত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রায় একশ বছর পরে আবির্ভূত হ'য়ে এই উদার মানস-সাধনাকেই আরও গভীরতর এবং বিস্তৃততর করে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্ত সাধনাকে কোন সাম্প্রদায়িক সাধনা বলে মনে করতেন না এবং রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণের শাক্ত সাধনার সঙ্গে অন্যান্য কোন সাধনারই কোন বিরোধ ছিলনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন সাধক বিভিন্ন সাধন-পথ অনুসরণ করে স্বার্থকতার স্বর্ণপুরীতে উপনীত হ'তে পারেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্মরণীয় কথা—"আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে ; আবার মুসলমান, খৃষ্টান, এরাও পাবে। আন্তরিক হ'লে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হ'বেনা' ; কি, 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হ'বেনা' ; 'আমাদের খৃষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবেনা।' এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি ; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়"।[১] সাম্প্রদায়িকতার লেশশূন্য এই উদার উপলব্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি। একেই সাধারণতঃ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীতি বলে উল্লেখ করা হয়।

রামপ্রসাদ মুখ্যতঃ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, একথাই বলেছেন। কিন্তু, মুসলমান, খৃষ্টান এরাও ঈশ্বর পাবে, এমন কথা সুস্পষ্টভাবে তিনি কোথায়ও বলেননি। অবশ্য পাবেনা এমন কথাও বলেননি। আসলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় এই ব্যাপারে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের অসাম্প্রদায়িক সাধনাকে আরও বিস্তৃততর করে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়, ইসলামধর্ম, খৃষ্টানধর্ম প্রভৃতি সবই শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় পৌঁছাবে, এবিষয়ে নিশ্চিতি প্রকাশ করেছিলেন।

রামপ্রসাদ যেমন হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়-পূজিত বিভিন্ন দেবদেবী স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন এই মত প্রকাশ করেছেন,

১ কথামৃত ২।২।৫

শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই সর্ব ধর্মে একই ঈশ্বর পূজিত হ'ন, একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা রামপ্রসাদের কথার প্রসারিত ও বিস্তারিত রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন —"আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এমত ভালনা। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে Water, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি,—হিন্দু বলছে জল, খৃষ্টান বলছে Water, মুসলমান বলছে পানি,—কিন্তু বস্তু এক"।[২]

সমস্ত পথেই ঈশ্বর পাওয়া যায়, এটা শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু কথার কথা নয়, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লব্ধ সত্য কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে"।[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন সময়ে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সুতরাং সমস্ত সাধনার সার্থকতার কথা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

রামপ্রসাদ এভাবে বিভিন্ন সাধন-পথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধিলাভ করার চেষ্টা করেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, রাম, কৃষ্ণ, শিব, কালী সবই এক, কিন্তু কৃষ্ণ-সাধনা, শিব-সাধনা, কালী-সাধনা ভিন্ন ভিন্নভাবে করেননি। তাঁর ধারণা ছিল, কালী-সাধনাই সকলেরই সাধনা। এই দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা যেমন বিস্তৃততর তেমনই গভীরতর, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সাধনা বিস্তৃততর

২ কথামৃত ৩।৩।৪

৩ ঐ ৩।৩।২

এইজন্য যে এই সাধনায় বিভিন্ন পথে অগ্রসর হ'য়ে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা আছে আর এটা গভীরতর এইজন্য যে, এই সাধনায় সমস্ত পথে সিদ্ধিলাভের গভীরতর অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয়েছে।

রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত তান্ত্রিক সাধনায় যে শব-সাধনা, ভৈরবী-চক্র-সাধনা বা অন্য প্রকারের পশ্বাচার সাধনা লক্ষ্য করা যায় তা অবলম্বন করেননি। স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধনা করা তিনি পছন্দ করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন "…আমার ওসব কিছুই ভাল লাগেনা—আমার সন্তানভাব"।[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের মতই সিদ্ধাই ও পঞ্চমকারের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে, এগুলো খুবই হীনভাব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সিদ্ধাইয়ের জন্য লোক পঞ্চমকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীনবুদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'ভাই! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমায় পাবেনা।' সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায়না,—মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হলো?—না মোকদ্দমা জেতা!…এসব অনিত্য"।[৫]

রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ মদে মত্ত হওয়ার চেয়ে ভাবে মত্ত বা তন্ময় হওয়াই কাম্য বলে মনে করতেন। 'কথামৃতে' প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের মতই শাক্ত সাধনায় বা মাতৃ পূজায় বাহ্য আচার—অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব দেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 'মনই মন্তর'। বার বার করে বলেছেন, 'ব্যাকুলতা চাই'। অন্তর দিয়ে অকপটভাবে 'মা' বলে ডাকতে পারলে নিশ্চয়ই মাতার প্রসন্ন দৃষ্টির প্রসাদ পাওয়া

৪ কথামৃত ৩।৬।২

৫ ঐ ৩।৬।২

যাবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও নির্দেশ। নিজেও তিনি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী জননীর যে পূজো করতেন, তাতে লোক দেখান আচার-আচরণের চেয়ে আন্তরিকতা ও তন্ময়তার প্রাধান্যই বেশী ছিল। সেজন্যই একদিন তাঁর পূজো-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেকেই রাণী রাসমণির দরবারে অভিযোগ এনেছিলেন। অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের পূজো-পদ্ধতির উচ্চস্তরের ভাবের দিকের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের কালী-পূজো সাধারণ পূজো ছিলনা, ছিল অসাধারণ সাধকের অসাধারণ পূজো।

রামপ্রসাদ যেমন নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতৃসাধনার পক্ষপাতী ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন সেই পথেরই পথিক। তিনি বলেছেন, "ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে"।[৬] সাধনা যে কোন লোক-দেখান ব্যাপার নয়, অন্তরের আর্তির প্রকাশ, একথাই বলতে চেয়েছেন সত্যিকারের সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ। উদার, উচ্চ ও সার্থক সাধনার এরূপের কথাই আমরা দেশে দেশে ও কালে কালে বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর সাধকের মুখে শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই রামপ্রসাদের গান করতেন। কথামৃত পাঠ করলে আমাদের এই ধারণাই হয়। আমাদের মতে রামপ্রসাদের সুরেলা কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের মনের ভাবও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত বলেই তিনি এমন করতেন। একথার প্রমাণ হিসেবে আমরা রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব-সাম্য এতক্ষণ লক্ষ্য করেছি এবং পরে আরও করবো তার উল্লেখ করতে পারি।

রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেননা, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। একই

---

৬ কথামৃত ১.১|১৫

ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ"।[৭] এই প্রসঙ্গ আরও বিস্তারিত করে তিনি বলেছেন—"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি;—অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায়না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায়না। সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায়না; সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায়না"।[৮]

সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনা আসলে ব্রহ্ম-সাধনা। কারণ, তিনি সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, 'কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী'। এই উপলব্ধি শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সত্তা সুরভিত করেছিল বলেই তিনি প্রায়ই রামপ্রসাদের 'প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি, আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি' গানটি গাইতেন।

রামপ্রসাদ যেমন বলেছেন, "তারা আমার নিরাকারা," শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি বলেছেন, "কালী নিগু´ণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী"।[৯] তিনি আরও বলেছেন, দূর থেকে দেখলে তিনি কালো, কিন্তু কাছে এলেই নিগু´ণা।" কথাটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন, "সমুদ্রেব জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো রং নাই"।[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করলেই রামকৃষ্ণ-সন্তানেরা 'কালী মন্দির' প্রতিষ্ঠা না করে 'বেদান্ত-মঠ' প্রাতষ্ঠিত করলেন কেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান বিদেশে

---

৭ কথামৃত ১।২।৪
৮ ঐ ১।২।৪
৯ ঐ ৩।১০।৫
১০ ঐ ১।২।৪

'অদ্বৈত মত' প্রচার করে প্রতিষ্ঠা পেলেন কেন তার রহস্য উদঘাটন করা যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনা আর অদ্বৈত সাধনায় স্বরূপত কোন ভেদ নেই, কারণ যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা' তিনিই আবার তাঁর মতে 'ব্রহ্ম'। এ এক অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

ভারতীয় দর্শন যেমন ন্যায় বৈশেষিক বহুতত্ব দিয়ে শুরু করে সাংখ্যের 'পুরুষ-প্রকৃতি'র দ্বৈত তত্বের ধারণার মধ্য দিয়ে অদ্বৈত বেদান্তের অদ্বৈত তত্বে পর্য্যবসিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, ভারতীয় সাধনাও তেমনি বহু দেবদেবীর আরাধনা দিয়ে শুরু করে শিব-শক্তি বা রাধা-কৃষ্ণের দ্বৈতভাবের রসাস্বাদনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম সাধনার অভেদ ও অদ্বৈত উপলব্ধিতে চরম সার্থকতা অর্জন করেছে। আমাদের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ উভয়ই ভারতীয় সাধনার এই চরম সমন্বয় ব্যক্তিগত উপলব্ধিব মধ্যে অধিগত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদের মাতৃসাধনার এ এক অদ্ভুত তুলনাহীন প্রকৃতি। সেইজন্যই দেখি, প্রচলিত অর্থে সাকার সাধক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধির জ্ঞানের গভীরে প্রায়ই সমাহিত হয়ে যান, বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, অদ্বৈত-উপলব্ধিতে বিলীন হয়ে যান। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সাকার কালী-সাধনায় ভক্তি সুধা রস আস্বাদন আবার নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধিতে নির্বিকল্প সমাধিলাভ মাতৃসাধনার দুই দিক লক্ষ্য করি। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিভাবে, সন্তানভাবে মায়ের স্নেহ সুধারস পান করারই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন, শুষ্ক সন্ন্যাসী হ'য়ে নির্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। সত্য অভেদ জেনে ও দ্বৈতবোধের লীলায় 'রসে বসে' থাকার প্রেরণা ছিল তাঁর অন্তরের গভীর প্রেরণা।

আমরা আগেই বলেছি, রামপ্রাদ প্রাণের আনন্দে গাইতেন, 'ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি'। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সেই সুরেই বলেছেন, "ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হ'তে ভাল

বাসেনা”।[১১] তারপর ভক্তের ভাব সম্বন্ধে আরও বলেছেন, “ভক্তের ভাব কিরূপ জান ? হে ভগবান্ ‘তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস,’ ‘তুমি মা, আমি তোমার সন্তান’...” (পূর্ববৎ)। আর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, “আমার সন্তানভাব”।[১২] ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে ভগবানের প্রেম সুধারস আস্বাদনে শ্রীরামকৃষ্ণের বড় প্রীতি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র এবং তদূর্ধ্বে সপ্তম চক্র সহস্রার যে চমৎকার সহজ ও সরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেছেন—‘বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান। যখন সংসারে মন থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি মনের বাসস্থান। মনের তখন উর্দ্ধদৃষ্টি থাকে না—কেবল কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে। আর চারির্দিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক্ হয়ে বলে, ‘একি !’ ‘একি !’ তখন আর নীচের দিকে (সংসারের দিকে) মন যায় না। মনের পঞ্চম ভূমি—কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়। মনের ষষ্ঠভূমি—কপাল। মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তখন ও একটু ‘আমি’ থাকে। সে ব্যক্তি নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মত্ত হয়ে, সেই রূপকে স্পর্শ আর আলিঙ্গন করতে যায় কিন্তু পারে না। যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম ছুঁলাম ; কাঁচ ব্যাবধান আছে বলে ছুঁতে পারা যায় না। শিরোদেশে, সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা

১১ কথামৃত ১।২।৩
১২ ঐ ২।৬।২

বেঁহুশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা"।[১৩] আর নিজের সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলছেন, "চিনি হ'তে চাইনা, চিনি খেতে ভালবাসি। আমার এমন কখন ইচ্ছা হয়না যে বলি 'আমি ব্রহ্ম'। আমি বলি 'তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস'। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ খেলান ভাল। ষষ্ঠ ভূমি পার হ'য়েই সপ্তম ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে আমার সাধ হয় না। আমি তাঁর নাম গুণ গান করবো, এই আমার সাধ"।[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য এখানে সুস্পষ্ট। সমাধির ভূমিতে অনেকক্ষণ থাকতে তাঁর সাধ হয় না। পঞ্চম আর ষষ্ঠ ভূমির মাঝখানে বাচ খেলার ইচ্ছাই তাঁর প্রবল। অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানে নির্গুণ ব্রহ্মের তাদাত্ম্য হ'য়ে সত্তার সম্যক জ্ঞান পেয়ে তাঁর সঙ্গে ভক্তিভাবে লীলা বিলাসই পরমহংসদেবের সাধ। এই ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝলেই রামকৃষ্ণদেবের মাতৃ সাধনার পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য সম্যক ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলে মনে করি। রামপ্রসাদ সম্পর্কে যেমন বলেছি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কেও তেমনি বলা যায়, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে সগুণ সাকার কালী রূপের মধ্যে পেয়ে তাঁকে ঘরোয়া সম্পর্কের 'মা' বলে অভিমান-অভিযোগ, আনন্দ-আহ্লাদ, আবদার হাহাকার সবই অকপটে অসঙ্কোচে তাঁকে জানিয়ে তিনি মা-র স্নেহ-সুধা-রস পান করে ধন্য হয়েছেন। নির্গুণ ও নিরাকারকে সগুণ ও সাকার মাতৃরূপে দর্শন ও তাঁর করুণা-রস প্রাণ ভরে আস্বাদন রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবনের বৈশিষ্ট্য।

(৪)

উচ্চস্তরের মাতৃসাধনা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের পর আর যে কয়জন

১৩ কথামৃত ১।৩।৬
১৪ ঐ ১।৪।৭

সাধকের মধ্যে লক্ষ্য করি তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ-এর নামই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানে সুগভীর পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি প্রথম দেশ-মাতৃকার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলা দেশে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম। 'আনন্দ মঠ'-এ প্রচারিত মাতৃসাধনা এবং সন্তানধর্ম একদিকে এবং গীতার নিষ্কাম কর্মের সাধনা অন্যদিকে বাংলার তৎকালান বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ বাণী ও এদের মা-এর চরণে জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা দিয়েছিল। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার ধারাকে বহন করেই বলেছিলেন—"ভুলিওনা ভারতবাসী, তুমি জন্ম হইতেই মা-এর জন্য বলি প্রদত্ত।" এ মা যেমন একদিকে দেশ-মা অন্যদিকে তেমনি বিশ্ব-মা। অরবিন্দ ঘোষ তাঁর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পদ নিয়ে এই শৃঙ্খলিতা দেশ-মা'র মুক্তির জন্য প্রয়োজনে 'মশী' আবার প্রয়োজনে 'অসি' ধারণ করেছিলেন। একদিকে যেমন 'বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখনী চালনা করে তিনি যুবকদের দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন সক্রিয় কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে তিনি সেই মন্ত্রের বাস্তব রূপ দেবার ও চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই তাঁকে 'অগ্নি যুগের অগ্নি ঋষি' বলা যেতে পারে।

ক্রমশঃ অরবিন্দ ঘোষ মাতৃ-সাধনার বৃহত্তর দিকটি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠলেন।[১৫] আমরা এই নিবন্ধের প্রথমেই বলেছি,

---

১৫ গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় "শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে" নামক গ্রন্থে এই সচেতনতার জন্য এবং সমগ্রভাবে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা যুক্তিতর্ক সহকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। উৎসাহী পাঠক রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্য

বাংলার মাতৃসাধনায় দেশ-মা-র সাধনা ও বিশ্ব-মা-র সাধনা মিলে মিশে কখনও কখনও একাকার হয়ে গেছে। আমাদের মনে হয়, অরবিন্দ ঘোষ বাংলার মাতৃসাধনার সেই ঐতিহ্য অনুসারেই দেশ-মার সাধনা করতে করতে বিশ্ব-মা-র সাধনায় নিজেকে বৃহত্তর পটভূমিকায় নিযুক্ত করেন। তিনি যেন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, দেশ-মা-র সাধনা বিশ্ব-মা-র সাধনা ভিন্ন সার্থক হ'তে পারে না, দেশের মুক্তি বৃহত্তর আত্মিক মুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা আংশিক দেখা মাত্র। সেজন্যই অরবিন্দ ঘোষের জীবনে দেশ-মুক্তির প্রচেষ্টা আত্মিক-মুক্তির প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হ'ল এবং দেশ-মা-র সাধনা রূপ নিল বিশ্ব-মা-র সাধনায়। দেশ-মা-র সেবক 'অগ্নিযুগের অগ্নিঋষি' অরবিন্দ ঘোষ বিশ্ব-মা-র 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' ঋষি শ্রীঅরবিন্দ-এ পরিণত হলেন।

শ্রীঅরবিন্দ মাতৃসাধনা যে উচ্চভাবের বাহন বলে গ্রহণ করেছেন তা সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িকতা দোষমুক্ত, উদার, বাহ্য অনুষ্ঠান বর্জিত, আন্তর সাধনা বিশেষ। এই দিক থেকে এই সাধনা রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার সগোত্র। অবশ্য আমরা জানি, শ্রীঅরবিন্দের সাধনার সঙ্গে রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অনেক বিষয়ে তফাৎ আছে। শ্রীঅরবিন্দের মাতৃসাধনা মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান আন্তর সাধনা বলেই তা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, একথা ভেবেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার কথা অবতারণা করছি। এখানে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের

বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলেও স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'ধর্ম' পত্রিকার ১৩১৬ সনের ১৯শে পৌষ তারিখের শ্রীঅরবিন্দ লিখিত প্রবন্ধই প্রমাণ। তিনি সেখানে সুস্পষ্টভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলে স্বীকার করেছেন।

উদ্দেশ্যে নয়, শুধু এই সাধনার মুল সূত্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লক্ষ্য।

রামপ্রসাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই স্বীকৃত অর্থে পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁরা উভয়েই উপলব্ধির গভীরতায় শাস্ত্র-মর্ম জেনেছিলেন। শাস্ত্রাদি গভীর মনোনিবেশ করে পাঠ করা এবং এদের সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করা তাঁদের চেষ্টার মধ্যেই ছিল না। তবে তাঁরা, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, শাস্ত্রের সার কথা এমন গভীরভাবে আন্তরিক উপলব্ধিতে বুঝেছিলেন যে তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়। রামপ্রসাদের গান যখন শুনি বা শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' যখন আস্বাদন করি তখন 'অপণ্ডিত' লোকের শাস্ত্র-জ্ঞানের ব্যাপকতা ও গভীরতা আমাদের বিস্ময়-বিমূঢ় করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন দর্শন ও সাধন-পদ্ধতির সার কথা গল্পের মধ্য দিয়ে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। মধ্য যুগে নানক, কবীর, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকদের মধ্যে এবং বাংলা দেশের বাউলদের গানে যেমন সহজ উপলব্ধির স্নিগ্ধ আলো আমাদের প্রাণ মন জুড়িয়ে দেয়, রামপ্রসাদের গান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা সেই ভাবেই মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। এই সাধকেরা সকলেই ছিলেন 'অপণ্ডিত' শ্রেণীর, কিন্তু সহজ উপলব্ধির সম্পদ এঁদের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ এই শ্রেণীর সাধক নন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর গভীর সমুদ্রে অবগাহন করেছিলেন নির্ভয়ে। সেজন্যই তাঁর কথায় ও লেখায় সেই পাণ্ডিত্যের দ্যুতি ছড়ান। তাতে অনেকেরই চোখ ঝলসায়। বক্তব্যের প্রকৃতরূপ অনেক সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, বক্তব্য বোঝাও সহজ হয় না। সেজন্যই রামপ্রসাদের গান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেমন সাধারণ লোকের অন্তর স্পর্শ করে, শ্রীঅরবিন্দ-এর পাণ্ডিত্য-পরিশীলিত প্রস্তাবাবলী তেমনভাবে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। তবে আমারা যে এখানে

শ্রীঅরবিন্দ-এর অবতারণা করেছি তার উদ্দেশ্য, তাঁর মাতৃসাধনার সাধারণ পরিচিতি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনাকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা।

সমস্ত মাতৃসাধনার মতই শ্রীঅরবিন্দ-এর মাতৃসাধনার কেন্দ্রবিন্দু 'মা' (The Mother)। রামপ্রসাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার পরিচিতি-প্রসঙ্গে দেখেছি, তাঁদের মতে এই মা 'কালী', কিন্তু তিনিই ব্রহ্ম। তাঁদের মতে শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। শ্রীঅরবিন্দের মতে 'মা' ভগবৎ-চৈতন্য (Divine Consciousness) বা ভগবৎ-ইচ্ছা (Divine will)। চৈতন্য এবং ইচ্ছাকে সমার্থক বলে শ্রীঅরবিন্দ চৈতন্য ও শক্তি একই তত্ত্বের দুই দিক বলে মনে করেছেন। সেজন্যই যাঁকে তিনি ভগবৎ চৈতন্য (Divine Consciousness) বলেছেন তাঁকেই আবার ভগবৎ-শক্তি (Divine Shakti) নামে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে চরম সত্তা একদিকে যেমন চৈতন্য, অন্যদিকে তেমনি শক্তি। দুইই তার সত্যরূপ। শাক্ত দর্শনে এই মতই প্রচারিত হয়েছে।[১৬] এজন্য শ্রীঅরবিন্দকে শাক্ত দার্শনিক বলা যায়। এই সত্তা নিরাকার এমন কথা শ্রীঅরবিন্দ কোথায়ও বলেননি। আমাদের মনে হয়, এই-দিক থেকে শ্রীঅরবিন্দ অনেকটা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং শাক্ত মতে বিশ্বাসী। শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। সেজন্য তিনি 'Life Divine' গ্রন্থে শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণ এমন ভাবে শঙ্কর মতের বিরোধিতা কোথায়ও করেননি। আমাদের মনে হয়, রামপ্রসাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই সাধনার শেষ অবস্থায় অদ্বৈত মতের সত্যতাই স্বীকার করেছেন। প্রমাণ হিসাবে রামপ্রসাদের এই

১৬ শাক্ত দর্শনের এই মত সার জন উড্রফ লিখিত Garlend of Letters দ্রষ্টব্য।

গানটি উল্লেখ করা যায়—'এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি'। একথা একান্তভাবেই অদ্বৈতবাদের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নির্বিকল্প সমাধির গভীরে সমাহিত হ'তেন তখন ত তাঁর অদ্বৈত-সিদ্ধিই হ'ত। আর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতসাধনা ত সকলেরই পরিচিত। এই প্রসঙ্গ আমরা বিস্তারিত ভাবে পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ই নিরাকার ব্রহ্ম সত্য জেনেও সাকার সাধনার লীলা রস আস্বাদনেই গভীর আনন্দ পেতেন। এঁরা দুজনেই সাকার ও নিরাকার সাধনার অবিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সাকারবাদী এবং অদ্বৈত নিরাকার তত্ত্বের চরম সত্যতায় অবিশ্বাসী। অদ্বৈত-সাধনা শ্রীঅরবিন্দের মতে সাধনার শেষ অবস্থা হ'তে পারেনা। তাঁর মতে সাধনার শেষ অবস্থা সমন্বিত যোগ সাধনায় (Integral yoga) লভ্য এবং সেই অবস্থায় চরম সত্তা চৈতন্য ও শক্তি-বিশিষ্ট সত্তারূপে অনুভূত হয়। সাধক যখন এই দিব্য অবস্থায় এসে পৌঁছান তখন তাঁর দেহ, মন ও চারপাশের জগৎ ভাগবৎ চৈতন্যের আনন্দ ও জ্যোতিতে অধ্যাহিত (Surcharged) হয়ে যায় এবং সমগ্র সত্তার রূপান্তর ঘটে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ 'The Mother' গ্রন্থে বলেছেন, "He would feel the presence of the Divine in every centre of his consciousness, in every vibration of his life-force, in every cell of his body. In all the workings of his force of Nature he would be aware of the workings of the Supreme World-Mother, the Super-nature ; he would see his natural being as the becoming and manifestation of the power of the World-Mother."

আমরা যতটা বুঝেছি, সিদ্ধির পর দেহের ভাগবৎ-সত্তায় রূপান্তরের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন না। সিদ্ধির পরও দেহ

দেহই থাকে তবে সিদ্ধ পুরুষের দেহবোধ থাকেনা।[১৭] সেজন্যই সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহেও দুরারোগ্য কর্কটরোগের আক্রমণ হয়েছিল, তবে এই দেহ-ব্যাধি তাঁর আত্মার আনন্দকে একটুও ম্লান করতে পারেনি। আরও কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ মনের সর্বোচ্চ ভূমি সপ্তভূমি বা শিরোদেশ বলে স্বীকার করেছেন। এবং সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, "সেখানে মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না। সর্বদা বেহুঁশ কিছু খেতে পারেনা, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।"[১৮] এই অবস্থায় পৌঁছালে শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সাধকের দেহই বেশী দিন থাকেনা, সঙ্গে সঙ্গে জগৎও লুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং সাধকের দেহের ও তাঁর চারপাশের জগতের রূপান্তরের প্রশ্নই ওঠেনা। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকতে চাননি, তবু এই অবস্থার সত্যতা এবং সর্বোচ্চতা সম্বন্ধে কোথায়ও কখনও সংশয় প্রকাশ করেননি। তবে কথামৃতে বার বারই তিনি বলেছেন, জ্ঞানের পথে এই অবস্থায় পৌঁছান খুবই কঠিন এবং সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সব বাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধারণার তফাৎ আছে। তবে তাঁদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে কিছু মিলও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন তন্ত্রোক্ত কারণবারিকে ভাবের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও তাই করেছেন। কারণ-বারিকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সোমরস, দিব্য আনন্দধারা (The mystic soma, the wine of the Divine bliss)। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, এ হচ্ছে 'প্রেমোন্মাদনা', এতে সাধক 'মদ-মাতাল' না

১৭ কথামৃত, ১।১২।৫

১৮ ঐ ১।৩।৬

হয়ে 'মন-মাতাল' হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই সোমরস বা আনন্দধারার গতি সম্বন্ধে এক তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই আনন্দ সৃষ্টির মূলীভূত আনন্দ। অমৃতময় আনন্দময় পরম পুরুষ জীবরূপ মনন-শক্তি যুক্ত জীবন্ত বস্তুপিণ্ডের ঘটে এই আনন্দরস-সুরা প্রতিনিয়ত ঢেলে দিচ্ছেন; নিত্য ও সুন্দর এই পুরুষ জীবের সত্তা ও প্রকৃতিকে সামগ্রিক ভাবে রূপান্তরিত করার জন্য আবার জীবরূপ বস্তুকোষে নিজেই প্রবিষ্ট হচ্ছেন।[১৯] ঔপনিষদিক আনন্দ তত্ত্বের ভিত্তিতে (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ··প্রভৃতি) কবি-কল্পনা বিস্তীর্ণ করে শ্রীঅরবিন্দ সোমরসকে বিশ্বচরাচরের প্রাণরস রূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ জাতীয় দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণার প্রয়োজন বোধ করেননি। তবে 'তিনিই সব হয়েছেন' এই সহজবোধ সহজ কথার সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্টভাবেই ছিল।

তন্ত্রের নির্বাণ ও ভব—মুক্তি ও ভুক্তির সমন্বয় ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মানুষ যেমন বিশ্ব জননীর (World-Mother) প্রসাদ পাবার জন্য উর্দ্ধ যাত্রা করে চলেছে, বিশ্বজননীও তেমনি তাঁর সন্তানকে প্রসন্ন করার জন্য নীচে নেমে আসছেন। ভক্তের উর্দ্ধ যাত্রা আর ভগবানের নিম্নাগমন, দুই-মিলে সাধকের সাধন পূর্ণ করে। তাঁর ধারণা, একথাটি এতদিন যেন অন্যেরা তেমন উপলব্ধি করেননি। তাঁরা শুধু ভক্তের উর্দ্ধ যাত্রার দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন, ভগবানের নিম্নাগমন তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। The Life Divine গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "The passionate aspiration of man upward to the Divine has not sufficiently

১৯ 'From the divine bliss, the original Delight of existence, the lord of Immortality comes pouring the wine of that bliss, the mystic soma, into these sheathes of substance for the integral transformation of the being and nature'—*The Life Divine.*

related to the descending movement of the Divine leaning downward to embrace eternally its manifestation. Its leaning in matter has not been so well understood as its truth in the spirit." সত্যের তাৎপর্য আমরা আত্মতত্ত্বের মধ্যে উপলব্ধি করতে শিখেছি, কিন্তু সেভাবে বস্তুতত্ত্বের মধ্যে পেতে চেষ্টা করিনি। শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্য শুধু বস্তু নিরাকৃত আত্মা নয়, সত্য বস্তুতেও আছে আবার আত্মাতেও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ একথা বলবেন না। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য।"[২০] ভারতীয় সাধকদের অধিকাংশেরই এই মত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ভগবানের আনন্দলাভ করলে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগেনা।"[২১] নিত্য মুক্তদের কথা বলতে গিয়ে তিনি হোমাপাখির গল্প বলেছেন। বলছেন—"হোমাপাখি আকাশেই ডিম পাড়ে, ডিম থেকে ছানা বেরিয়ে যখন সে দেখে নীচে পড়ে যাচ্ছে তখন সে মায়ের দিকে আকাশে চোঁ চা দৌড় দেয়।"[২২] অর্থাৎ মুক্তদের আকর্ষণ ভূমার প্রতি, ভূমির প্রতি নয়। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের উপরি উদ্ধৃত বক্তব্যের যদি সহজ অর্থ করে বলা যায় যে, সাধক যখন ব্যাকুল হ'য়ে ভগবানকে ডাকেন তখন ভগবান কৃপা করে সাধককে ধরা দেন তাহ'লে এ কথার সমর্থন সমস্ত ভক্তিপথের সাধকেরাই করবেন। অবশ্য এমন কথাও শ্রীঅরবিন্দ সত্যিই বলেছেন, "There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavour, a fixed unfailing

---

২০ কথামৃত, ১।১।৫

২১ ঐ ৩।১৪।৬

২২ ঐ ১।১।৭

aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers."[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "দু'রকম সাধক আছে ;—এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে আঁকড়িয়ে মাকে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হ'বে, এত ধ্যান করতে হ'বে, এত তপস্যা করতে হ'বে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধরতে যায়। বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারেনা। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে ; মা তাকে মুখে ক'রে এখানে ওখানে ল'য়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানেনা। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারেনা,—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন"। শ্রীরামকৃষ্ণ-বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সাধকের একদিকে যেমন থাকে মায়ের জন্য ব্যাকুল কান্না, অন্যদিকে থাকে মায়ের নেমে এসে তাকে দেখা দেওয়া। এই প্রকার সাধকের সাধনার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যাত সাধন-পদ্ধতির সঙ্গতি আছে, কিন্তু প্রথম প্রকার সাধকের সাধনার সঙ্গে এর মিল নেই। সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের কৃপার কথা শ্রীঅরবিন্দের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ, কোথায়ও কোথায়ও স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "সাধনার জন্য প্রয়োজনীয় তীব্র বৈরাগ্য ঈশ্বরের কৃপাতেই লাভ করা সম্ভব।"[২৪]

তন্ত্রে যে আধারশুদ্ধির কথা আছে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর

---

২৩ The Mother, p 1.

২৪ কথামৃত, ১।৪।৩

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। আধারশুদ্ধি বলতে দেহস্থ ভূত শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি বোঝায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি-দ্বারা সাধক যদি দিব্য আনন্দ বা সোমধারা ধারণের ক্ষমতা অর্জন না করেন তবে দিব্য আনন্দ তাঁর জীবনে বিপর্য্যয় ডেকে আনে। অপক্ক পাত্রে কোন তীব্র সুরা যেমন রাখা যায় না, পাত্র ফেটে যায়, তেমনি দিব্য সোমরস ধারণের ক্ষমতা যদি সাধক অর্জন না করেন তবে দিব্য আনন্দ তাঁর জীবনে অনর্থ আনে।[২৫]

শ্রীরামকৃষ্ণও বার বার বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে কিছু হ'বে না। তাঁর নিজের ভাষায় বলছি—"চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বক টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেল্লে তখন চুম্বক টানে, মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর আর অমন কাজ কর্বো না' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তাহ'লে ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বর রূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লয়। তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।"[২৬] আবার তিনি বলেছেন, "এই মনে নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে, ঐ মন নীচ হয়ে যায়।"[২৭] আধার বিশুদ্ধ না হলে সাধক সিদ্ধাই লাভ করে বাহাদুরি দেখায়, আসল লাভ তাঁর কিছুই হয়না। সিদ্ধাই লাভের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত নিন্দার চোখে

---

২৫ 'If the psychic mutation has not taken place, if there has been a pre-mature pulling down of the higher Forces, their contact may be too strong for the flawed and impure material of Nature and its immediate fate may be that of the unbaked jar of the Veda which could not hold the divine Soma wine ; or the descending influence may withdraw or be split up because the nature cannot contain or keep it'—*The Life Divine.*

২৬ কথামৃত, ১।৪।৭

২৭ ঐ ১।১।৫

দেখেছেন। আমরা এ প্রসঙ্গ পুর্বেই আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য সে-আলোচনা আর করছি না। শ্রীরামকৃষ্ণ লোক দেখলেই সাধন-ক্ষেত্রে তার কতটুকু ক্ষমতা ও যোগ্যতা বুঝতে পারতেন এবং সে অনুসারে তার জন্য ব্যবস্থা-পত্র করতেন। নরেনকে দেখিয়ে তিনি বলতেন 'ওর অখণ্ডের ঘর' এবং ওর পক্ষে যা সম্ভব অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

সাধনায় সিদ্ধির জন্য শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বজননীর ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন (complete and unconditional surrender to the will of the Mother)। এই আত্মসমর্পণ যত গভীর হ'বে সাধকের দিব্য আনন্দের অনুভূতি তত তীব্র হ'বে।[২৮] এই আত্মসমর্পণের কথা শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন। তিনি বলেছেন—"আচ্ছা, তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক।"[২৯] সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের উদাহরণ হিসেবে তিনি বেড়াল ছানার কথা বলতেন। সে কথা আমরা আগেই বলেছি।

শ্রীঅরবিন্দের মতে সাধনার পথে অগ্রসর হ'য়ে সর্বকর্মে ভগবৎ-ইচ্ছা যত অনুবর্তন করা যাবে বা অহং-বোধ পরিত্যাগ করা যাবে ততই সিদ্ধি সহজলভ্য হ'বে। তিনি বলেছেন, "You must grow in the divine consciousness till there is no difference between your will and hers, no motive except her impulsion in you, no action that is not her conscious

২৮ 'In proportion as the surrender and self-consecration progress the Sadhaka becomes conscions of the Divine Shakti doing the Sadhana, pouring into him more and more of herself founding in him the freedom and perfection of the Divine Nature'—*The Mother*, p 13.

২৯ কথামৃত, ১।১২।৫

action in you and through you."[৩০] সবই মায়ের কর্ম, এই বোধই সত্যবোধ। শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথাই বলেছেন, "আমি করছি, এটি অজ্ঞান থেকে হয়; হে ঈশ্বর তুমি করছ—এইটি জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা।"[৩১]

'অহংবোধ' নিয়ে কর্ম করলে দুর্গতি আর 'তোমার বোধ' নিয়ে কর্ম করলে ঊর্দ্ধগতি, একথাই বিশ্বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প বলতেন। আমরা সেই গল্পটি এখানে তুলে দিচ্ছি—

"আমি আমি করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে তা বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম্‌মা,, 'হাম্‌মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংস-গুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ারী হবে! লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে তাতেই দুর্গতির শেষ হয়না। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ীভুরিগুলো দিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন বোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্‌মা, হাম্‌মা' বলেনা। তুঁহু তুঁহু বলে, তবেই নিস্তার তবেই তার মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয়না। জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী', তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম ক্ষেত্রে আসতে হয় না।"[৩২]

---

৩০ *The Mother*, p 17-28

৩১ কথামৃত, ১।১০।৫

৩২ ঐ ১।১০।৫

একই সুরে শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, "And afterwards you will realise that the divine Shakti not only inspires and guides, but initiates and carries out your works ; all your movements are originated by her, all your powers are hers, mind, life and body are conscious and joyful instruments of her action, means for her play, moulds for her manifestation in the physical universe."[৬৩] সাধক ক্রমশঃ তাঁর সমস্ত কর্ম যে দিব্য শক্তিরই কর্ম, তিনি যে দিব্যশক্তির হস্তে একটি যন্ত্র মাত্র তা উপলব্ধি করে ধন্য হয়। এরও পরে ভক্ত ও ভগবানের পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায় এবং ভক্ত ভগবানেরই অংশ হ'য়ে তাঁর শক্তি, চৈতন্য এবং আনন্দ-এর অধিকার লাভ করেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই অবস্থাই সাধনার ক্ষেত্রে সর্বশেষ পরম সিদ্ধির অবস্থা। কাব্য সুরভিত সুললিত ভাষায় এই অবস্থা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "The last stage of this perfection will come when you are completly identified with the Divine Mother and feel yourself to be no longer another and separate being, instrument, servant or worker but truly a child and eternal portion of her consciousness and force. Always she will be in you and you in her ; it will be your constant simple and natural experience that all your thought and seeing and action, your very breathing or moving come from her and are hers. Yon will know and see and feel that you are a person and power formed by her out of herself, put on from her for play and yet always safe in her, being of her being, consciousness

---

৬৩ *The Mother*, p 30

of her consciousness, force of her force, ananda of her Ananda."[৩৪]

দর্শনের যে কোন ছাত্রই জানেন, সিদ্ধ বা মুক্ত অবস্থার এই বর্ণনার সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিক রামানুজের মুক্ত অবস্থার বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রামানুজ-মতে মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা যে পরমাত্মারই অংশ, এই উপলব্ধি সুস্পষ্টভাবে হ'য়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দও এই উপলব্ধির কথাই বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেন, সাধনার পদ্ধতি ভেদে উপলব্ধির তারতম্য হবে। ভক্তি পথে গেলে আমি তাঁর সন্তান, এই উপলব্ধি হ'বে আবার জ্ঞানের পথে গেলে সাধক সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাবেন। তিনি ঈশ্বরীয় অবস্থার বিভিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে।"[৩৫] এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর মণি, আভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। কিন্তু এ অভেদ-জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হ'লে হয়না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়—তাই অহং তত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যায়।···সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি' এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি প্রার্থনা শুনছ' এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাকবে। এই ভেদ বোধ ; আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ, মেয়ে,

---

৩৪ *The Mother*, p 32-33

৩৫ কথামৃত, ১।১২।২

আলো, অন্ধকার, এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি মানতে হ'বে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায়না। আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদবুদ্ধি আছে, —ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হ'বে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে, কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।"[৩৬]

শ্রীঅরবিন্দ সাধনার চরম অবস্থা বলে 'The Mother' পুস্তকে যার বর্ণনা দিয়েছেন এবং যা আমরা উপরে উদ্ধৃত করেছি তা আমাদের মতে সগুণ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির বর্ণনা। এই অবস্থায় সাধক শ্রীঅরবিন্দের মতে "truly a child and eternal portion of her consciousness and force" হ'ন, মা-এর সন্তান এবং তাঁর অংশ বলে উপলব্ধি সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ভেদজ্ঞানের ফল। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ যতই একে অভেদোপলব্ধির লক্ষণ বলে মনে করুন না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তা স্বীকার করবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে অভেদোপলব্ধির ক্ষেত্রে সমাধি হয় এবং তখনকার বোধ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গটি উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক? পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ জ্ঞান হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। তখন আমি-রূপ নুনের পুতুল সচ্চিদানন্দ-রূপ সাগরে গলে এক হয়ে যায়, আর একটুও ভেদ বুদ্ধি থাকেনা।"[৩৭]

(৫)

বাংলার মাতৃসাধনার যে গভীরতা ও উদারতার পরিচয় আমরা

---

৩৬ কথামৃত, ১।১২।৯

৩৭ ঐ ১।৩।৪

সাধক রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি তা-ই বাংলার মাতৃসাধনার সত্যিকারের রূপ। বিরাট বিরাট মূর্তি গড়িয়ে পাঠা বা মহিষ বলি দিয়ে বিভিন্ন উপচারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে মায়ের যে পুজো করা হয় তা আসলে বাংলার মাতৃসাধনার তাৎপর্য্য প্রকাশ করেনা। অথবা 'পঞ্চ-মকার'-কে অবলম্বন করে যে সমস্ত গুহ্য সাধনার প্রচলন আছে তার মধ্যে যে বিভৎসতা ও উন্মত্ততা আছে তাও আমাদের মাতৃসাধনার সত্যিকারের পরিচয় নয়।

গভীর আধ্যাত্মিকতা, তন্ময়তা, ব্যাকুলতা, মানস সাধনা প্রভৃতি মিলিয়ে বাংলার মাতৃসাধনা এমন একটা উচ্চগ্রামে উপনীত হয়েছে যে সাধনার ক্ষেত্রে এর তুলনা সহজলভ্য নয়। শ্রীসত্যদেব নামে একজন সাধক মাতৃসাধনার এই ঐতিহ্য বহন করে 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'র এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'সাধন-সমর' তিন খণ্ডে তাঁর এই ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। তাঁর বক্তব্যের সামান্য একটু আভাস এখানে দেওয়া হ'ল।

শ্রীসত্যদেব সাধনাকে একটি সমর বা যুদ্ধ বলে মনে করেছেন। সাধনার প্রতিবন্ধক বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বুদ্ধদেবের 'মার'-জয়ের সাধনার কথা মনে পড়ে। সমস্ত সাধকেরাই অবশ্য সাধনার প্রতিবন্ধক পরাহত করার সাধনার কথা বলেছেন। শ্রীসত্যদেব বলেন, মাতৃসাধনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' এই সাধন-সমর-এর নিহিতার্থই প্রকাশ করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন অসুর-নিধন করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হ'বে। বিবিধ সংস্কার, অস্মিতা-মমতা প্রভৃতি স্বরূপোলব্ধির পথে নানাপ্রকার

অন্তরায় সৃষ্টি করে। শ্রীসত্যদেবের মতে যা কিছু স্বরূপোপলব্ধির পথে বাধা দান করে তা সবই অসুর। পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধি বলতে তিনি মায়ের কোলে নিত্যানন্দে অবস্থান বোঝেন। তাঁর মতে নিজের ভেতরের ইন্দ্রিয়াদিই দেবতা— কারণ এদের দ্বারাই পরমাত্মার প্রকাশ হয়। তিনি বলেন, সংস্কার-বাসনা, কর্মবীজ, অস্মিতা-মমতা প্রভৃতি অসুরগণ দিব্যশক্তি প্রকাশের মাধ্যম ইন্দ্রিয়-রূপ দেবতাদের নির্যাতন করেন। এই নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে হলে শ্রীসত্যদেবের মতে নিজের ভেতরে শক্তির জাগরণ করতে হ'বে, ব্যক্তি-চৈতন্যকে শক্তি-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে এবং শক্তি-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যরূপে গ্রহণ করতে হ'বে। অর্থাৎ শক্তি যে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিতা, তিনি খড়্গ-মুণ্ড ধারিণী হয়েও যে বরাভয়দায়িনী এই বোধ সাধককে অর্জন করতে হ'বে এবং তা করলেই ব্যক্তি-চৈতন্যকে মাতৃ-চৈতন্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হ'বে এবং তখনই সাধক মাতৃক্রোড়ে স্থান লাভ করে নির্ভয়ে আনন্দাস্বাদনের অধিকারী হবেন।

শ্রীসত্যদেব বলেন, "বেদের দেবী সুক্তই শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভিত্তি এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার তাদাত্ম্য প্রদর্শনই দেবী সূক্তের মূল কথা। তিনি আরও বলেন, 'দেবী মাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়া রূপে উপাখ্যানাকারে বর্নিত হইয়াছে। পরমাত্মাও মহামায়া অভিন্ন। শাস্ত্রীয় তর্কমূলক বিচারে কিংবা মৌখিক আলো-চনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক বলা যায় মাত্র, কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা জানেন—আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। যতক্ষণ সাধনা আছে, ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়া রূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা—তখন সাধ্য নাই, সাধন নাই, সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা, চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসিলেই, আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মাই দেবী-সূক্তের প্রতিপাদ্য

বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়া রূপেই অভিবর্ণিত হইয়াছে।"[৩৮] এই আলোচনার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী ও ব্রহ্ম এক' এই প্রতীতির সঙ্গতি লক্ষ্যনীয়।

শ্রীসত্যদেব অন্যত্র বলেছেন, "এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে—সত্য। আমরা জানি—মায়া সগুণব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন বহুত্বের স্পন্দনে অভি-স্পন্দিত না হইয়া বহুভাবে বিরাজিত প্রকাশশক্তিকে উপসংহৃত করিয়া স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তিনি ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুণ নির্বিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতীত। যতক্ষণ জীব-জগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তিনি মহামায়া। যতক্ষণ মাতৃলাভ, ততক্ষণ মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকল্পিত শিশুচৈতন্যই জীব। ব্যোম-পরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকলেই মহামায়ার অঙ্কস্থিত সন্তান মাত্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ আকারে নিত্য প্রকাশিত। আমি ফুলে ফুল দেখিনা, দেখি মা; ফলে ফল দেখিনা, দেখি মা; জলে জল দেখিনা, দেখি রসময়ী মা; বায়ু বায়ু নহে, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূর্য্য চন্দ্র সূর্য্য নহে, মাতৃচক্ষু বা মা; বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল; এই পরিদৃশ্যমান জগৎই মায়ের প্রকটমূর্তি।"[৩৯] এই বক্তব্য আসলে একজন শাক্ত সাধকের বক্তব্য। শাক্ত সাধনায় মায়াকে মহামায়া বলা হয়। এই মতে শিব ও মহামায়া দুইই সত্য।

এই প্রতীতির সঙ্গে তুলনীয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"আদ্যা-শক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি,

৩৮ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, 'দেবী-সূক্ত' পৃ ৶

৩৯ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা

স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেননা, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ।"[৪০] এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আরও স্মরণীয় কথা—"সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন, বেদে আছে উর্ননাভির কথা; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধান আধেয় দুই।"[৪১]

শ্রীসত্যদেব বলেন, মহামায়ার এক প্রকাশ যেমন জগৎরূপে অন্যপ্রকাশ তেমনি সাধকের ইষ্টমূর্তিতে। যেখানেই মূর্তি সেখানেই মহামায়া। ব্রহ্মকে মূর্তিতে দেখার সাধকের ঐকান্তিক আকাঙ্খার নামই 'সন্তানভাব'। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেও এই 'সন্তানভাব'—এ সাধনারই বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা এপ্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করেছি।

মূর্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীসত্যদেব বলেছেন, "প্রত্যেক মূর্তিই শক্তি বিশেষ। শক্তি যখন ঘনীভূত হয়, সাধকের করুণ ক্রন্দনে উদ্বেলিত হয়, তখনই বিশিষ্ট মূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।... সকল সাধকেরই এইভাবে ইষ্ট দর্শন হয়। কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকল মূর্তি আবির্ভাবের ইহাই রহস্য—সর্ব্বপ্রথমে একটি ঘন চিন্ময় জ্যোতিঃ বা প্রকাশ সত্তার উপলব্ধি হইতে থাকে। পরে উহা সাধকের ভক্তিহিমে ঘনীভূত হইয়া সংস্কারানুরূপ মূর্তিতে পরিণত হয়।"[৪২]

এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"...সচ্চিদানন্দ,

৪০ কথামৃত, ১।২।৪

৪১ ঐ ১।২।৪

৪২ সাধন-সমর, ২য় খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা

সমুদ্র—কুল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন।"[৪৩] এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়, 'ভক্তিহিম' কথাটি উভয় সাধকই ব্যবহার করেছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীসত্যদেব বলেছেন—"সঞ্চিত প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কর্মসংস্কার বা বাসনা বীজই মুক্তির অন্তরায়। সূক্ষ্মদর্শনে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমগুণরূপে পরিচিত। ইহারাই ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত। যতদিন এই গ্রন্থিভেদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর উৎপীড়ন বিদূরিত হয়না। একমাত্র মাকে দেখিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি তস্মিন দৃষ্টে··· ।' মাতৃচরণে আত্ম সমর্পণ করিবার পর সাধক দেখিতে পায়,—তাহার এই হৃদয় গ্রন্থি সম্যক উচ্ছেদ করিবার জন্য, মা স্বয়ং চণ্ডিকা মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এক একটি গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকগণের হৃদয়ে মা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই চণ্ডীর এক একটী রহস্য। প্রথম—মধু-কৈটভবধ বা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ, দ্বিতীয়—মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ, তৃতীয়—শুম্ভবধ বা রুদ্রগ্রন্থি ভেদ।"[৪৪]

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণও মায়ের কাছে আত্মসমর্পণের কথা, আম্মোক্তারি দেবার কথা এবং বেড়াল ছানার মত হয়ে থাকার কথা সাধকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা এপ্রসঙ্গ আগেই আলোচনা করেছি। এখানে একথা তুলনীয় বলেই উত্থাপন করলাম।

শ্রীসত্যদেব মা'কে দুইদিক থেকে দেখেছেন। একদিকে যেমন তিনি নানা অস্ত্রশস্ত্র ধারিণী অসুরমর্দিনী চণ্ডী, অন্যদিকে তিনি বরাভয় দায়িনী অন্নপূর্ণা। একদিকে যেমন তিনি সাধককে বিভিন্ন কর্মবীজ

৪৩ কথামৃত, ১।৩।৪

৪৪ সাধন-সমর, ১ম খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা

রূপ অসুরের নির্যাতন থেকে মুক্তি দেন, অন্যদিকে তেমনি সাধককে নিজ কোলে স্থান দিয়ে অপরিসীম আনন্দের অধিকারী করেন। শ্রীসত্যদেব মাকে মুখ্যতঃ চণ্ডী বা দুর্গারূপে দেখেছেন আর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কালীরূপে পেয়েছেন। অবশ্য যা-ই দুর্গা তা-ই কালী এই বোধ যেমন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি ছিল শ্রীসত্যদেবের। আমরা পূর্বেই বলেছি, বাংলার মাতৃসাধনা যেমন দুর্গতি-নাশিনী দুর্গাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তেমনি আবর্তিত হয়েছে কলুষনাশিনী কালীকে ঘিরে। দুর্গা ও কালী দুইই শক্তি এবং সেইদিক থেকে এক ও অভিন্ন।

(৬)

বাংলার মাতৃসাধনার বৈচিত্র্য ও গভীরতা নিয়ে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করেছি এবং এই সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-সাধনার স্বরূপোপলব্ধির প্রয়াস পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার তাত্ত্বিক গভীরতা, উদার সার্বজনীন আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বোপরি ব্যাকুলতা-তন্ময়তা-নিষিক্ত একান্ত ঘরোয়া সম্পর্কের নিবিড়তা আমাদের মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। ভাবের গভীরতা এবং উপলব্ধির অন্তরঙ্গতা মিলে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার এমন একটা সার্বজনীন ও সহজ আন্তরিক আবেদন আছে যা যে কোন বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোকেরই বুদ্ধি ও হৃদয় স্পর্শ করে এবং মানুষ সাময়িকভাবে হলেও একটা উচ্চ চিন্তা ও অনুভূতির স্বর্গলোকে উন্নীত হয়। সাধকের সিদ্ধির কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ লোকের এই সাময়িক অনুভূতির মূল্যও অপরিসীম। সেজন্যই বলি, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনা সব দিক থেকেই সার্থক। এই মাতৃসাধনা শেষ পর্যন্ত অদ্বৈত সাধনায় রূপান্তরিত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেননি। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, চরম উপলব্ধিতে একমাত্র

ব্রহ্মই সত্য আর সব কিছুই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "বিচার আর কি করবো? দেখছি—তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন। তা ও বটে, আবার তা ও বটে।"[৪৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন—"আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎ সমুদ্র অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর এ'তেই লয় হ'য়ে গেল।"[৪৬] শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য, তিনি উপলব্ধি করেছেন, যিনি ব্রহ্ম ও নিত্য তিনিই এই জগৎ হ'য়ে লীলা করছেন। এই উপলব্ধি শঙ্করের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে ভিন্ন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম কখনও কিছু হন না। সুতরাং তাঁর লীলার কথা অবান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে বলেছেন—"বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায় তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হ'বেনা। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হ'বে। যারই শাঁস তারই লীলা।···আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বোলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তাহ'লে যে ওজনে কম পড়বে।"[৪৭] শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।"[৪৮] শ্রীরামকৃষ্ণের মতে পূর্ণ জ্ঞান হ'লে সগুণ ব্রহ্মই যে নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি শক্তি বা কালী তিনিই যে ব্রহ্ম, এই বোধ সুস্পষ্টভাবে জাগে। শঙ্করাচার্য সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে বলেন, পূর্ণ জ্ঞান হ'লে সগুণ ব্রহ্ম এবং শক্তি মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যাত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন, "যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়,

---

৪৫ কথামৃত, ১।১৪।৭

৪৬ ঐ ১।১৩।৬

৪৭ ঐ ১।১৩।৬

৪৮ ঐ ১।১২।৯

ততক্ষণ 'নেতি', 'নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তাঁরা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ, জীব জগৎ শুদ্ধ তিনি।"[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা সুস্পষ্টভাবে শাক্ত দর্শনের কথা। শাক্ত মতে শিব ও শক্তি মিলে পূর্ণ সত্তা। শক্তি কোন অবস্থাতেই মায়া নয়। শক্তিই জগৎ-প্রসবিনী। সুতরাং জগৎ মিথ্যা হ'তে পারেনা।

তবে শ্রীরামকৃষ্ণ একথাও বলেন, অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরে সত্যের বিভিন্ন রূপ দ্রষ্টার কাছে ভাসে, এসব রূপই সত্য এবং এদের মধ্যে স্বরূপতঃ অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার ভাষ্যকার বিবেকানন্দ একটি উপমা দিয়ে কথাটি বুঝিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি ফটো তুলে তুলে সূর্যের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে তবে ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে সূর্য্যের বিভিন্ন ছবি উঠবে, এসব ছবিই সূর্য্যেরই ছবি এবং এদিক থেকে এদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। সাধনার ক্ষেত্রেও সাধকের ক্ষমতা এবং অভিরুচি অনুসারে সত্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, এ সবই সত্যেরই রূপ এবং এদিক থেকে সমস্ত সাধনাতেই স্বরূপতঃ অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম-সমন্বয় কথাটির তাৎপর্য এই ভাবেই বুঝতে হ'বে। বিভিন্ন ধর্ম সত্য লাভের বিভিন্ন পথ। সব পথই একই সত্যে নিয়ে পৌঁছায়। বিভিন্ন সাধনা বা বিভিন্ন ধর্ম একত্র করে পরিপূর্ণ সাধনা বা পরিপূর্ণ ধর্মের রূপ পাওয়া যাবে এমন কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কোথায়ও বলেন নি। তাঁর বক্তব্য সব সাধনা এবং সব ধর্ম অন্য নিরপেক্ষভাবে সার্থক এবং এদিক থেকে এদের মধ্যে অভেদ।

---

৪৯ কথামৃত, ১।৯।২

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

ভারতীয় দর্শন ও সাধনার পরিচিতি-প্রসঙ্গে 'সমন্বয়' কথাটি বহু ব্যবহৃত। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই দৃষ্টি ভঙ্গীকে সামগ্রিক বা সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী (Synthetic outlook) বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় দর্শন তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysics), জ্ঞান-বিজ্ঞান (Epistemology), তর্কবিজ্ঞান (Logic), নীতিবিজ্ঞান (Ethics) প্রভৃতির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেনা; যে কোন সমস্যাই ভারতীয় দর্শনে সম্ভাব্য সমস্ত দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ তাত্ত্বিক, তার্কিক, নৈতিক প্রভৃতি দিক থেকে আলোচিত হয়ে থাকে। ভগবদগীতায় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন সাধন পথের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। আচার্য্য উদয়ন 'আত্মতত্ত্ববিবেক' গ্রন্থে ভারতীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের সমন্বয় প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। ঋক্‌বেদে একই সত্য এবং সত্তাকে পণ্ডিতেরা যে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (একং সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি)।

এসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে বহু লোকই ভারতীয় দর্শন আলোচনাকালে 'সমন্বয়' কথাটি ব্যবহার করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভারতীয় দর্শন ও সাধনার মর্মবাণীর প্রকাশক ধর্ম-সমন্বয়ের ঋষি বলে উল্লেখ করা হয়। অত্যন্ত আধুনিক কালে একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান নিয়ে আলোচনা করে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, আমাদের ধারণা এই

গ্রন্থে এবং অন্যত্র 'সমন্বয়' কথাটি সাধারণতঃ যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ভারতীয় দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা প্রসঙ্গে সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ কল্পিত এবং বোধ হয় ভ্রান্ত। আমরা এই নিবন্ধে প্রথমতঃ ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এবং পরে রামকৃষ্ণ-সাধনায় 'সমন্বয়' কথাটি কি তাৎপর্য্য প্রকাশ করে তা আলোচনা করবো।

ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমন্বয় রয়েছে তা দর্শন সম্প্রদায়গুলোকে একত্র করার মধ্যে নিহিত নেই। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সমন্বয় বলতে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের একীকরণ বোঝায় না, বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অভেদ আছে, তাই ব্যক্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও যখন বিভিন্ন সাধনার সমন্বয়ের কথা বলেন তখন তিনি এদের একত্র করার কথা বলেন না, এদের মধ্যে যে অভেদ আছে, এরা যে সবই সত্য লাভের বিভিন্ন পথ, একথার ওপরই প্রাধান্য দেন। আমাদের বক্তব্য এবার বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করবো।

(২)

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ পণ্ডিত ৺মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ 'ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয়' বিষয়ে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধরচন্দ্র মুখার্জী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে বক্তৃতা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে। আমাদের ধারণা, ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সমন্বয় এই মনস্বী অধ্যাপক যে ভাবে প্রদর্শন করেছেন তাই শাস্ত্রানুমত এবং সত্য। আমরা এখানে তাঁর বক্তব্যের সার কথা তাঁরই ভাষায় তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন—"ভারতীয় দার্শনিক গণ সর্ববিধ অধিকারীকে ক্রমশঃ নিঃশ্রেয়স পথে উপারূঢ় করিবার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকারী পুরুষগণের আশয় বৈচিত্র প্রযুক্তই আচার্য্য-গণ বিভিন্ন পক্রিয়ার অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া

দেখিলে তাঁহারা এক কথাই বলিয়াছিলেন। যাহা অপরমার্থ, যাহা পরিণামী, তাহা ক্ষণিক, তাহা সত্যবস্তু হইতে পারে না। অপরমার্থত্ব, অনিত্যত্ব, পরিণামিত্ব, ক্ষণিকত্ব, জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য। যাহা অপরমার্থ, যাহা অনিত্য তাহা মিথ্যা। কোনও বস্তু অপরমার্থ বা অনিত্যও বটে আবার তাহা সত্যও বটে, এইরূপ হইতে পারে না।

* * *

সমস্ত বৈদিক দার্শনিকগণের মতে আত্মা পরমার্থ সত্য, কিন্তু এই আত্মার অনিত্যত্ব, অপরমার্থত্বাদি কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং যাহা পরমার্থ সত্য আত্মা, তাহাতে অনিত্যত্বাদি নাই। ঘট-পটাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার সত্যত্ব স্বীকার কেবল অধিকারী শিষ্যের আশয়ানুরোধে করা হইয়াছে। বিষয়রাগী পুরুষের চিত্ত বিষয়ের অনিত্যত্বচিন্তাতেই উদ্বিগ্ন হয়—বিষয়ের প্রতিক্ষণ-পরিণামিত্ব প্রতিক্ষণ-বিনাশিত্ব চিন্তাতে তাহার চিত্ত আরও উদ্বিগ্ন হয়। বিষয়ের মিথ্যাত্বচিন্তা করিতে তাহার সামর্থ্যই হয় না। ইহার কারণ তীব্র বিষয়রাগ। তীব্র বিষয়রাগী পুরুষগণও শাস্ত্রকারগণের অনুগ্রাহ্য। তাহাদের রক্ষাও শাস্ত্রকারগণের প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ কথঞ্চিৎ অধিকারী পুরুষের আশয়ানুসারে দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়া শিষ্যগণের আশয় রক্ষা করিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—

> 'দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা।
> ভিদ্যতে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ।'[১]

বক্তব্য এই, অধিকারীভেদে ভারতীয় দার্শনিকগণ মুক্তিলাভের জন্য বিভিন্ন পথনির্দেশ দিয়েছেন। অধিকারীভেদবাদ ভারতীয় দার্শনিকদের একটি বহুপ্রচারিত মতবাদ। এই মতানুসারে সকলেরই সব ব্যাপারে

---

১ ডঃ মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ: ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয় ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

অধিকার নেই। বিভিন্ন লোকের রুচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা অনুসারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। ফলে তাদের কাছে সত্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। যার ধাতে যা সয় ভারতীয় দর্শনে তার জন্য তাই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দার্শনিকপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য অধিকারীভেদবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন—'The difference of adhikāra or spiritual status is not necessarily a gradation, and so for as it is a gradation it does not suggest any relation of higher and lower that implies contempt or envy. The notion of adhikāra in fact, means, in the first instance, just an acceptance of fact or realism in the spiritual sphere. It is a question of duty rather than of rights in this sphere, and a person should be anxious to discover his actual status in order that he may set before himself just such duties as he can efficiently perform in spirit. It is a far greater misfortune here to overestimate one's status than to underestimate it. A higher status does not mean greatar opportunity for spiritual work, since work here means not outward achievement but an inwardizing or deepening of the spirit.'[২]

অধিকারভেদ বলতেই সাধারণ স্তরভেদ বোঝায় না, আর যতটা স্তরভেদ বোঝায় তাতে অবজ্ঞা বা ঈর্ষা করার মত কোন উচ্চ এবং নীচের সম্পর্ক বোঝায় না। অধিকারভেদ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়। এই ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্নটা বড় নয়, কর্তব্যের প্রশ্নটাই বড়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্থান আবিষ্কার

২ K. C. Bhattacharyya : Advaitavada and its spiritual significance. (Studies in Philosophy, Vol I, p 121.)

করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, কারণ তা আবিষ্কার করলেই কোন্ কাজ সে সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবে তা তার পক্ষে নিরূপণ করা সম্ভব হ'বে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির স্থান প্রসঙ্গে নীচ ধারণা পোষণ করার চেয়ে ও উচ্চ ধারণা পোষণ অধিকতর দুর্ভাগ্যের। উচ্চ স্থান আধ্যাত্মিক কর্মের অধিকতর সুযোগ এনে দেয় না, কারণ কর্ম বলতে এখানে কোন কিছু অর্জন বোঝায় না, আত্মার নিবিড়তর এবং গভীরতর উপলব্ধি বোঝায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় দর্শনের 'অধিকারভেদবাদ' একটি চমৎকার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। উপমাটি অত্যন্ত নিপুণভাবে বক্তব্য প্রকাশ করেছে। সেজন্য আমরা এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের উপমা উদ্ধার করছি। তিনি বলেছেন, "যার যেমন রুচি। আর যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানা রকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও করে দেন, কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। যার পেটে যা সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। যার যেমন রুচি।"[৩] বিভিন্ন লোকের রুচি ও সহ্যক্ষমতা বিভিন্ন রকমের। সেজন্য মাছ বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্ন ভাবে রান্না করা হয়। বিভিন্ন লোকের রুচি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে সত্যও তাদের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং একই সত্যকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে দর্শন করেন। দ্রষ্টার বিভিন্নতায় সত্যের বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যের এই বিভিন্ন রূপে একই সত্য প্রকাশিত হয়। সেজন্য রুচিপ্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের কাছে সত্য বিভিন্ন রূপে ভাস্বর হয়েছে, কিন্তু এই বিভিন্নতা একান্ত ভাবেই বাইরের ব্যাপারে, স্বরূপের দিক থেকে এরা একই সত্যকে প্রকাশ করেছে। এই দিক থেকে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের

৩ কথামৃত, ২।২।৩

মধ্যে অবিরোধ বা সমন্বয়ভাব বর্তমান। ভারতীয় দর্শনে সমন্বয় কথাটিকে এই ভাবেই বুঝতে হ'বে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করতেন। তিনি বলছেন, কোন লোক যদি সূর্যের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সূর্যের ফটো তুলে তুলে চলে, তবে ব্যক্তির অবস্থান অনুসারে সূর্যের বিভিন্ন ছবি উঠবে, তাদের মধ্যে পার্থক্যও কিছু থাকবে, কিন্তু তারা যে একই সূর্যের বিভিন্ন ছবি, একথা অস্বীকার করা যাবে না। ভারতীয় দার্শনিকেরাও এমনিভাবে নিজেদের যোগ্যতা এবং অবস্থান অনুসারে সত্য-সূর্যের বিভিন্ন রূপে দর্শন পেয়েছেন। তাঁদের এই বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্নতা থাকলেও এরা একই সত্যের দর্শন বলে সমন্বিতও বটে।

ভারতীয় দর্শনের অধিকারবাদ প্রসঙ্গে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করেন। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এ মতবাদ জীবনের অভিজ্ঞতার এতই অনুগত যে প্লেটো এবং ব্র্যাড্‌লির মত পাশ্চাত্য দার্শনিকও তা স্বীকার না করে পারেননি। প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী বলে উল্লেখ করেছেন এবং ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ব ধাতু অনুসারে কার্য করাই সমীচীন বলে মত প্রকাশ করে-ছেন। বিভিন্ন ধাতু অনুসারে তিনি ব্যক্তিদের দার্শনিক, যোদ্ধা এবং ব্যবসায়ী নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করেছেন।

ব্র্যাডলি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষেরই সমাজে একটি বিশিষ্ট অবস্থান (Station) আছে এবং এই অবস্থান অনুযায়ী তার কর্তব্য (duty) নির্দিষ্ট হয়। প্রত্যেক মানুষেরই তার অবস্থান অনুসারে কাজ করা উচিত এবং অন্য কাজ করা অনুচিত। ভগবদ্গীতায় স্বধর্ম বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে ব্র্যাড্‌লি তাই অবস্থান অনুসারে কর্তব্য (Station and its duty) বলে প্রচার করেছেন। এই ক্ষেত্রে আসল কথাটা আমাদের এই বলে মনে হয় যে, 'যার কাজ তারই

সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে'। দর্শন এবং সাধনার ক্ষেত্রেও অধিকারী ভেদে বিভিন্ন কর্তব্য এবং বিভিন্ন পথ নির্দিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় দর্শনে আমরা এই স্বাভাবিক ব্যাপারটিই লক্ষ্য করি।

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা আস্তিক দর্শন এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন নাস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। সকলেই মূলতঃ আত্মানুসন্ধানী, আত্মতত্ত্বের প্রকৃতি-নির্ণয়-প্রয়াসী। চার্বাকদের দৃষ্টিতে দেহই আত্মা, সুতরাং দেহসুখলাভই একমাত্র কাম্য। চার্বাক-দৃষ্টি সাধারণ লোকের একান্ত অপরিশীলিত দৃষ্টি। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মা দেহ নয়, মনও নয়, তবে স্বরূপতঃ অচেতন একটি দ্রব্য। ইন্দ্রিয় যখন বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তখন আত্মায় চৈতন্য গুণের আবির্ভাব হয়। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। এই আত্মার যথার্থ জ্ঞানই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের আদর্শ। এখানে দৃষ্টি চার্বাকের চেয়ে পরিশীলিত। সাংখ্যযোগ দর্শনে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ; চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ নয়, আত্মার স্বরূপ। এই আত্মা মাত্র একটিই হ'তে পারে। কিন্তু, সাংখ্যদর্শনে তা স্বীকৃত নয়, সাংখ্যমতে আত্মা বহু। কিন্তু, আত্মার বহুত্বের যে কারণ দেওয়া হয়েছে তা আসলে দেহের ভিন্নতা প্রমাণ করে, আত্মার ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না। সাংখ্যকর্তারা বলেছেন, জন্ম, মরণ এবং করণ যেহেতু বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাবে হয়, সুতরাং আত্মার বহুত্ব মানতে হয়। কিন্তু জন্ম, মরণ ও করণ যে দেহগত ব্যাপার, আত্মগত নয়, একথা খেয়াল করা হয়নি। এখানে দৃষ্টি চার্বাক এবং ন্যায়-বৈশেষিকের চেয়ে অনেক বেশী গভীর, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্মল নয়। সেজন্যই 'আত্মা এক ও অদ্বিতীয়' এ কথাটি স্বীকৃত হয়নি। শঙ্করের বেদান্তে একথা স্বীকৃত হয়েছে। এখানেই আমরা দার্শনিকের দৃষ্টি সবচেয়ে গভীর এবং একান্ত নির্মল বলে মনে

করি। রামানুজ বেদান্তে ন্যায় মত এবং অদ্বৈত মতের মধ্যপথ অনুসরণ করা হয়েছে। রামানুজ মতে আত্মা স্বরূপতঃ চেতন দ্রব্য। চৈতন্য ন্যায়-বৈশেষিকের মত এখানে আত্মার আগন্তুক গুণ নয়, নিয়ত বর্তমান গুণ, তবে শঙ্কর বেদান্তের মত আত্মার স্বরূপ নয়। এখানে দৃষ্টি ন্যায়-বৈশেষিকের চেয়ে গভীর, কিন্তু শঙ্কর বেদান্তের মত তলস্পর্শী নয়। আত্মা সম্বন্ধে পূর্বমীমাংসা দার্শনিকদের মত অনেকটা ন্যায়-বৈশেষিক মতেরই মত। পূর্বমীমাংসা মতেও আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। এখানে দার্শানকের দৃষ্টি ন্যায়দৃষ্টির মতই চার্বাকের চেয়ে পরিশীলিত, কিন্তু অত্যন্ত গভীর নয়। বৌদ্ধদর্শনে আত্মা বলে নিত্য কোন দ্রব্য স্বীকৃত নয়, আত্মা বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধের সমাহার। সেজন্যই বৌদ্ধ আদর্শ নির্বাণ, কর্ম-নাশ বা জন্ম-নিবারণ, আত্মপ্রাপ্তির কোন সদর্থক আদর্শ বৌদ্ধ দর্শনে প্রকীর্তিত হয়নি। জীবনের দুঃখ ও তার নিবারণের উপায় আবিষ্কারেই সমস্ত প্রযত্ন বৌদ্ধ দর্শনে নিবিষ্ট রয়েছে। দুঃখ-নাশের পর কোন সদর্থক অবস্থার কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন বৌদ্ধ দার্শনিক ভাবেননি। বৌদ্ধদের বিশেষ দৃষ্টিই তাঁদের এই মতের জন্য দায়ী। জৈন দর্শনে জীব বা আত্মাকে চেতনা-লক্ষণ বলা হয়েছে ;- কিন্তু, এই চৈতন্য সমস্ত জীবে বা আত্মায় সমান মাত্রায় নেই, একথাও স্বীকৃত হয়েছে। তীর্থঙ্কর বা পূর্ণ পুরুষদের মধ্যেই চৈতন্য সব চেয়ে বেশি মাত্রায় বর্তমান, অন্যান্য সকলের মধ্যেই চৈতন্যের মাত্রা এর চেয়ে কম। আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত আনন্দ ও অনন্ত শক্তির আধার। তবে কর্মজন্য আত্মায় মালিন্য আসে। এই মালিন্য দূর করে আত্মার স্বরূপে উপলব্ধি জৈন আদর্শ। জৈন দর্শনের আদর্শ সুস্পষ্টভাবেই বৌদ্ধ আদর্শ থেকে আরও দূরপ্রসারী। বৌদ্ধ আদর্শ নির্বাণ, জন্ম-নিবারণ, কিন্তু জৈন আদর্শ জন্ম-নিবারণ ত বটেই তা ছাড়াও আরো কিছু। জৈন দার্শনিকেরা আত্মার অনন্ত চৈতন্য,

অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত শক্তির অধিকারী হবার অভিলাষী। আত্মা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্যই বৌদ্ধ এবং জৈন আদর্শের এই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের কাছে আত্মার প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং তাঁদের বক্তব্যও এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে যে বিরোধের কথা আমরা ভাবি, তা আপাতঃ বিরোধ মাত্র। আসলে এখানে একই সত্যে পৌঁছাবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছি। একটি উপমা দিলে কথাটি বোঝা যাবে। অনেকতলা বাড়ীতে উঠতে হলে একতলা দোতলা, তিনতলা, চারতলা হয়েই শেষতলায় উঠতে হ'বে। বিভিন্ন তলায় কোন বিরোধ নেই, শেষতলা ছাড়া সবতলাই শেষতলায় পৌঁছে দেবার পথ। ভারতীয় দর্শন অনেকতলা বাড়ীর মত। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় এক একটি তলা। সবতলা শেষ পর্যন্ত সব চেয়ে উচ্চ অদ্বৈত বেদান্ত তলায় পৌঁছে দেবে। অনেকতলা বাড়ীর সবতলাগুলো যেমন বিরুদ্ধ নয়, সমন্বিত, ভারতের বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমনি বিরোধ নেই, সমন্বয় রয়েছে। নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যেমন লোকেরা অনেকতলা বাড়ীর বিভিন্ন তলায় বাস করে, তেমনি সামর্থ্য বা অধিকার অনুসারে তত্ত্বদর্শনের অভিলাষীরা ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন অনেকতলা বাড়ীর সব তলাই রোদ-বৃষ্টি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, তেমনই ভারতীয় দর্শনের সব সম্প্রদায়ই জগতের দুঃখ দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ দেয় ক্লিষ্ট মানবসন্তানদের।

আমরা যেভাবে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের অবিরোধ বা সমন্বয় প্রদর্শন করেছি, আচার্য উদয়ন 'আত্মতত্ত্ব বিবেক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম সে-পথ অনুসরণ করেছেন। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ

তর্কতীর্থ মহাশয় 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়' গ্রন্থের উপসংহারে আচার্য উদয়নের বক্তব্য উদ্ধার করেছেন। আমরা কৌতূহলী পাঠকের তৃপ্তিবিধানের জন্য মহামহোপাধ্যায়ের বই থেকে সে অংশটি তুলে দিচ্ছি।

'আত্মতত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে "আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"[৪] মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের এই সারতম উপদেশ ভারতীয় সর্বশাস্ত্রের সার নির্যাস।...আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। প্রিয়তমা মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পারিব্রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চরম উপদেশ বিবৃত করিবার জন্যই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অসংখ্য ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।...আত্মতত্ত্ব বিবেকের শেষভাগে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন, মোক্ষের জনক আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। উপ-নিষদ্বাক্যসমূহ দ্বারা আত্মার শ্রবণ এবং শ্রুত অর্থের সম্ভাবিতত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রুত্যনুকূল যুক্তিসমূহ দ্বারা শ্রুত অর্থের মনন এবং মনন দ্বারা সম্ভাবিত অর্থের সাক্ষাৎকারের জন্য নিদিধ্যাসন। একই আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে আত্মতত্ত্ব অপরোক্ষ-ভাবে ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষাবভাসই মোক্ষ। এই আত্মতত্ত্বের নিদিধ্যাসনে বা উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলে অধিকারীর নিকটে সমস্ত জগৎপ্রসঙ্গ আত্মার বাহিরে বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। আর এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই কর্মমীমাংসাশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বাহ্য অর্থে দৃষ্টির প্রাবল্যহেতু চার্বাক মতের উত্থান ঘটিয়াছে। আর ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" অনাত্মবস্তু গ্রহণপটু ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয়ই দর্শন করে; আত্মদর্শন করে না। এ অবস্থাতে

---

৪ আচার্য উদয়ন: আত্মতত্ত্ববিবেক (এসিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ) ৯৩৫ পৃষ্ঠা

এজন্যই চার্বাক মতের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। যে দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কর্মমীমাংসকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই দৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "কর্মাভির্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ, প্রজাবন্তো দ্রবিণ মৃচ্ছমানা, অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ।"[৫] অনন্তর আত্মোপাসক উপাসনার প্রকর্ষবশতঃ আত্মাকে অর্থাকারে দর্শন করেন। তখন উপাসক দেখেন আমি সর্বাত্মক। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মপরিণামবাদ ত্রিদণ্ডী সিদ্ধান্ত পর্যবসিত হইয়াছে। আর বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। এই 'আত্মা' যে অর্থাকার তাহা 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্' এই শ্রুতিও প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপাসক এই অবস্থায় বিশ্রান্ত না হউক, এজন্য শ্রুতি অর্থাকার আত্মস্বরূপের নিষেধ করিবার জন্য 'অগন্ধমরসমচক্ষুরশ্রোত্রম' ইত্যাদি বলিয়াছেন। আত্মার বিষয়াকারতার নিষেধে আত্মোপাসক বিষয়ের অভাব দর্শন করেন। তখন আর রূপ রসাদি বিষয়ের স্ফুরণ থাকে না। প্রপঞ্চরহিত আত্ম স্বরূপ ভাসমান হয়। এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তদ্বার মাত্র উপসংহৃত হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া উদয়ন নির্দেশ করিয়াছেন। বিষয়রহিত চিন্মাত্র বস্তু সম্ভাবিত নহে বলিয়া এই অবস্থা অবলম্বন করিয়া শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ স্বসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নৈরাত্ম্যবাদের প্রতিপাদক 'অসদেবেদমগ্রে আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতি ও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুগ্রাহক রহিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উপাসককে ব্যুত্থিত করিবার জন্য নৈরাত্ম্য দৃষ্টি হইতে উপাসককে ঊর্ধ্বে উত্থিত করিবার জন্য 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ' ইত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। অনন্তর উপাসক আত্মার সহিত বিষয়ের বিবেকদর্শন করিয়া থাকে। এই বিবেকদর্শনকে লইয়াই সাংখ্যসিদ্ধান্ত উপসংহৃত হইয়াছে।

৫ বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৪-১-৫৯

আর শক্তিই বিশ্বজননী, আত্মা নির্লেপ এই সিদ্ধান্তের সমুত্থান ঘটিয়াছে। শ্রুতি ও 'প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্মাকে নির্লেপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বিবেকদৃষ্টি প্রত্যাখ্যানের জন্য শ্রুতি 'নান্যৎ সৎ' ইত্যাদি বলিয়াছেন অর্থাৎ আত্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন সৎ বস্তু নাই। এই অবস্থায় কেবল আত্মাই প্রকাশমান থাকে। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতমতের উপসংহার করা হইয়াছে। এই অবস্থা প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি 'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ' ইহা বলিয়াছেন। কেবল আত্মা বাক্য ও মনের অতীত। এই অবস্থা কখনও হেয় হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি ইহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এই অবস্থায় যখন আত্মমাত্র প্রকাশমান থাকে, তখন বিষয়দর্শন হয় না। তাহার প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি—'ন পশ্যতীত্যাহুরেকী ভবতি' ইত্যাদি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিষেধ মুখে বস্তুর প্রতিপাদনে ও নিষিধ্যমান বস্তুর উল্লেখপূর্বক বস্তুর প্রতিপাদন করিতে হয়। নিষিধ্যমান বস্তুর উল্লেখপূর্বক পরমার্থ বস্তুর প্রতিপাদন যথার্থ প্রতিপাদন নহে। এজন্য দ্বৈত নিষেধের উল্লেখপূর্বক অদ্বৈত প্রতিপাদন সমীচীন হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি নিষেধ মুখে তত্ত্বপ্রতিপাদন হইতে বিরত করিবার জন্য 'ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতম্' ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক দক্ষ স্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ৪-১-৩ ব্রহ্মসূত্রের ভামতী ও কল্পতরুতেও 'যত্ত্বদ্বৈতে ন তেষোঽস্তি মুক্ত এবাসি সর্বদা' এইরূপ বলা হইয়াছে। সংক্ষেপ শারীরকেও বলা হইয়াছে, 'স্থিরমতিঃ পুরুষঃ পুনরীক্ষতে ব্যপগতদ্বিতয়ং পরমং পদম্' (২-৮৯)। এই অবস্থায় জীবের সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইয়া যায় বলিয়া আর আত্মবিষয়ক সবিকল্পক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এজন্য আত্মবিষয়ক নির্বিকল্পক জ্ঞানই উদিত হয়। আত্মমাত্র বিষয়ক নির্বিকল্পক জ্ঞানই মোক্ষনগর প্রবেশের

শ্রেষ্ঠতম দ্বার। এইখানেই ন্যায়দর্শন উপসংহৃত হইয়াছে। আর ইহাতেই চরম বেদান্তও উপসংহৃত হইয়াছে। আর এই অবস্থা প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি "নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ স ব্রহ্মৈ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে"[৬] এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাতে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন, "চরম বেদান্তে যাহা বলা হইয়াছে তদপেক্ষা আর অধিক কিছু বলিবার নাই—'শুদ্ধ স্বপ্রকাশচিৎ স্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তানামুপসংহারঃ প্রতিপাদ্যান্তরবিরহাৎ।' আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতীয় বৈদিক দর্শনসমূহের সিদ্ধান্ত রহস্য প্রদর্শন করিলাম। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রে নানা প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক স্রোতসমূহ মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছে।"

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা ও বাণীর মধ্যে ভারতীয় দর্শনের এই মূল সূত্রটি অত্যন্ত নিপুণভাবে অব্যাহত রেখেছেন। তিনি এই সূত্রটিকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও কবেছেন। সেজন্যই তাঁকে সর্বধর্মসমন্বয়ের ঋষি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে দর্শনচর্চা কখনও করেননি। তিনি সাধক। সাধনা করেছেন, উপলব্ধি করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সাধনায় এবং উপলব্ধিতে ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ের সার্থকতা এবং সত্যতা জেনে তাই বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম সত্যলাভের বিভিন্ন পথ। তিনি বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম প্রভৃতি সবই ইষ্টলাভের সহায়ক। হিন্দু ধর্মের মধ্যে আবার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে তাও

৬ বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ৪-১-৫৯

একই লক্ষ্যে পৌছে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব; ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আব পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেন না। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন।…কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌছান যায়।"[৭] শ্রীরামকৃষ্ণের একথা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কথা। তিনি নিজে বিভিন্ন সাধনপথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেজন্যই তাঁর এই বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করা কঠিন।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সিদ্ধিলাভের বিভিন্ন সাধনপথ বলে সর্বত্র স্বীকৃত। সাধারণতঃ মানুষ এদের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিতে এদের অবিরোধ বা সমন্বয়ের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন—"জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে। একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম, এ নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নাই। জ্ঞানীরা এরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—

৭ কথামৃত, ২।১৫।১

জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, জীব, জন্তু এসব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হ'তে ভালবাসে না। ভক্তের ভাব কিরূপ জান? হে ভগবান, 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস,' 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান' .আবার 'তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতা বা মাতা', 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ।' ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমিই ব্রহ্ম'। যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্য মন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে। কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরমাত্মা; ভক্তের ভগবান।"[৮]

সর্বধর্ম-সমন্বয়-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই একটি উপমা ব্যবহার করতেন। বক্তব্য এই উপমার মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন, "যেমন 'জল', 'Water', 'পানি'। এক পুকুরে তিন চার ঘাট; এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরেজেরা জল খায়, তারা বলে 'Water'। তিনিই এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'God' কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"[৯]

---

৮ কথামৃত, ১।২।৩

৯ ঐ ১।২।৪

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন নামে একই ঈশ্বরকে অভিহিত করেন, একই জল যেমন কারো কাছে 'জল', কারো কাছে 'পানি', কারো কাছে 'Water' নামে পরিচিত হলেও সকল নামেই তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা রাখে, তেমনি ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তিনি সাধককে দর্শন দানে তৃপ্তি ও শান্তি বিতরণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উপরিলিখিত বক্তব্যের নিহিতার্থ এই ভাবে প্রকাশ করা যায়।

বৈদান্তিকদের 'ব্রহ্ম' তান্ত্রিকদের 'শক্তি' বা 'কালী' প্রভৃতি ধারণার মধ্যে অনেকেই বিরোধ লক্ষ্য করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদের অভেদ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

দুধ কেমন ? না, ধবোধবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম রূপ ভেদ।"[১০]

বিশ্বের চরম সত্তা সগুণ না নির্গুণ, এই ব্যাপারে তাত্ত্বিক

১০ কথামৃত, ১।২।৪

পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, চরম সত্তা সগুণ, আবার কেউ বলেন নির্গুণ। দর্শনের ইতিহাসে সগুণ ও নির্গুণ ধারণার দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এই দ্বন্দ্ব-এর সমন্বয় বিধান করেছেন। তিনি বলেন, একই সত্তাকে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার জন্য কখনও সগুণ, কখনও বা নির্গুণ বলে মনে হয়। কাছে থেকে দেখলে সত্তা নির্গুণ, তবে দূর থেকে দেখলে তাকে সগুণ বলে ধারণা হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের শঙ্করাচার্যের বক্তব্য স্মরণে আসে। তিনি বলেছেন, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে নির্গুণ, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তা-ই সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অনেকটা শঙ্করাচার্যের অনুরূপ। তবে শঙ্করাচার্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে লব্ধ ঈশ্বরকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। আমাদের ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেন না। তাঁর মতে ব্রহ্মও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। তিনি বলেন, 'কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী'।

সগুণ ও নির্গুণ ধারণার সমন্বয় প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে ছ্যাখো কোন রঙই নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছ্যাখো—রং নাই।"[১১]

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, এ নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। একবার এক ব্রহ্মভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে সাকার—কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?"[১২] এ প্রশ্নের

১১ কথামৃত, ১।২।৪

১২ ঐ ১।৩।৫

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কথা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায় তা হলে তিনিই সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে?" একথা বলেই বক্তব্য বোঝাবার জন্য একটি গল্প বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন—"একটা গল্প শুন। একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্লে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে—'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ। আর একজন বল্লে—'না না—আমি দেখেছি, হল্‌দে!' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, না জরদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে,—'আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বল্‌ছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল আরও সব কত কি হয়। বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।" গল্পটি বলেই তার নিহিতার্থ নিজেই প্রকাশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সে-ই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানা রূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ, আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।"[১৩]

[১৩] কথামৃত, ১।৩।৫

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সাকার এবং নিরাকার তত্ত্বের সমন্বয় প্রদর্শন করেছেন, মধ্যযুগীয় আর একজন সহজ সাধকও এই পথ অনুসরণ করেছিলেন। আমরা কবীরের কথা বলছি। কবীর বলতেন—'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়াবে ব্রহ্ম নিরাকার এবং কালী সাকার, কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্মই কালী এবং কালীই ব্রহ্ম।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ-এর অখণ্ডদৃষ্টিতে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার সমস্ত তত্ত্বেরই সত্যতা এবং অভিন্নতা প্রতিভাত হয়েছে, তবু তিনি সাধারণ মানুষের জন্য সাকার ভাবই ভাল বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সব পথই পরম পুরুষার্থ লাভের পথ বলে স্বীকার করেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিপথকেই সাধারণ লোকের পক্ষে নিরাপদ বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদ-পদ্মে যেন ভক্তি হয়। যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি!"[১৪]

কর্মযোগ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগী হয়ে যায়। বেশি দেরী সয় না। এখন ডিঃ গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা।

---

১৪ কথামৃত, ১।৩।৫

ভক্তিযোগই যুগধর্ম।"[১৫] একথা বলেই ব্রাহ্মভক্তদের উদ্দেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নামগুণগান কর, তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎকে স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) বলো, এও বেশ! তোমরা ভক্ত! ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।"[১৬]

জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"বেদে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা রকম অবস্থার বর্ণনা আছে। সে জ্ঞানপথ—বড় কঠিন পথ। বিষয়-বুদ্ধির—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির—লেশ-মাত্র থাকলে জ্ঞান হয় না। এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়। ভক্তিপথ খুব ভাল ও সহজ।"[১৭]

সাধারণ লোকের পক্ষে ভক্তিপথ খুব ভাল ও সহজ মনে করতেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ নির্লিপ্ত সংসারীর খুব প্রশংসা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরলাভ করতে হলেই যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে জ্ঞানপথে অগ্রসর হ'তে হ'বে তার কোন মানে নেই। তিনি বলেন, 'গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বরলাভ সম্ভব।' আমরা 'রামকৃষ্ণ-সাধনার স্বাতন্ত্র্য' নিবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধারণার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, ভক্ত গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণের মতে একজন ধন্য পুরুষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীর পুরুষ! যেমন কারু মাথায় দুমণ বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে, মাথায় বোঝা—তবুও সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না। যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই।

---

১৫ কথামৃত, ১।২।৯
১৬ ঐ ১।২।৯
১৭ ঐ ১।৩।৬

পানকৌটি জলে সর্বদা ডুবে মরে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।”[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য, পাঁকাল মাছ পাঁকে থেকেও যেমন পঙ্কিল হয় না, পানকৌটি জলে থেকেও যেমন জল-বদ্ধ নয়, তেমনি ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে যে সংসার করে সে সংসারের জটিল জালে বদ্ধ হয় না। মাথায় বোঝা নিয়ে বর দেখা যেমন কঠিন, তেমনি সংসার করে ও নানা ঝঞ্ঝাটে থেকেও যে গৃহী নিয়ত পরম পুরুষের পাদবন্দনা করেন, তিনি খুব কঠিন কাজ করছেন বলে সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—সংসার করেও পরম পুরুষের নিয়ত বন্দনা করা যায় কি ভাবে? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেন—“সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার; তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক, তিন মাস হোক বা এক মাস হোক! সেই নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বলতে হয়, ‘আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনি আমার সর্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁকে পাব!”[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ভক্তিলাভের পর সংসার করতে কোন বাধা নেই। তিনি বলেন—“ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগে না। সংসার জলের স্বরূপ আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হ'য়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখ, তা হলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাসতে থাকবে।”[২০]

১৮ কথামৃত, ১।১৫।১
১৯ ঐ ১।১৫।১
২০ ঐ ১।১৫।১

উত্তম ভক্ত কে, এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন তিনিই উত্তম ভক্ত। প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে ছাদে পৌঁছাতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি—ইট চূণ শুরকী—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের একথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলছেন, বিচার করে বাদ দিয়ে দিয়ে ব্রহ্মকে গ্রহণ করার পর তিনিই যে সব হয়েছেন একথা বুঝতে হ'বে, তবেই পূর্ণবোধ হ'বে। এক্ষেত্রে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য সুস্পষ্ট। শঙ্করাচার্যের মতে নেতি নেতি করে ব্রহ্মে গিয়ে পৌঁছালে ব্রহ্ম ভিন্ন আর সবই মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, নেতি নেতি করে ব্রহ্মে গিয়ে পৌঁছালে তিনিই যে জীব জগৎ হয়েছেন তা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধারণার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-এর বক্তব্য সমন্বিত হয়েছে। অদ্বৈততত্ত্বে গিয়ে পৌঁছালে তিনিই যে বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বও বটেন, একথা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গ আরও স্পষ্ট করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তাঁরা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ, জীবজগৎশুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোসা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখত, তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না; ওজন করতে হ'লে খোসা বীচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এতো ওজনের ছিল। খোলাটা যেন জগৎ; জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব

২১ কথামৃত, ১।৬।৩

আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্তাতে শাঁস নেই সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোসা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে। অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তা হ'লে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।" বক্তব্য আরও বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা, যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য, যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হন, তিনি জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন—বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভাল মন্দ, শুচি অশুচি সমস্ত।"[২২]

শঙ্করাচার্য বলেন, যে জেনেছে সে ব্রহ্ম ভিন্ন সবই মিথ্যা বলে মানে; আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন। দুজনের বক্তব্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট। শঙ্করাচার্য শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন সবই প্রত্যাখ্যান করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত সবই গ্রহণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অখণ্ড বা সমন্বয়ের দৃষ্টিতে কিছুই মিথ্যা নয়, সবই বিভিন্ন ভাবে সত্য; কিছুই বর্জনীয় নয়, সবই গ্রহণীয়; কিছুই হেয় নয়, সবই উপাদেয়।

দার্শনিকের দৃষ্টিতে শঙ্করাচার্যের বক্তব্য অকাট্য এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হন এবং তিনি যদি নির্গুণ হন, তবে সৃষ্টি সত্য হ'তে পারে না। কারণ, এই ব্রহ্মের পক্ষে সৃষ্টির মত কোন কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য শঙ্করাচার্য যখন ব্রহ্মকে সত্য বলে জগৎকে মিথ্যা বলেন, তখন তাঁর যুক্তির অকাট্যতা স্বীকার করতেই হয়।

২২ কথামৃত, ১।৯।২

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে দার্শনিক ছিলেন না। তিনি দর্শন-চর্চা করেননি। দার্শনিকতা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। তিনি সাধক। উপলব্ধির আলোতে তিনি পথ চলেছেন। সাকার, নিরাকার; সগুণ, নির্গুণ; অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের যে সমন্বয়-বিধান শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন তা তাঁর অখণ্ড উপলব্ধির ফল। এ প্রসঙ্গে যুক্তিপ্রয়োগ অবান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা সহজ সরল অন্তরস্পর্শী আবেদন আছে যা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং কেমন একটা বিশ্বাসের অনির্বাণ দীপ-শিখা মনে জ্বালিয়ে দেয়। দর্শনের কূটতর্ক বিচার পরিত্যাগ করে আটপৌরে উপমা-ভিত্তিক শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সাধারণতঃ মানুষ স্বেচ্ছায় সন্দেহ ছেড়ে আত্মসমর্পণ করে। আমরাও আপাতত এই ব্যাপারে ব্যতিক্রম হ'তে চাই না।

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যদের যা বলতেন নিজেও তা করতেন। সমস্ত ধর্ম-মতই সত্যলাভের পথ বলে প্রচার করে তিনি নিজে সব পথই অনুসরণ করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আমরা একথা পূর্বে বহুবার বলেছি। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি; দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টা-দ্বৈত; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমস্ত পথই তিনি অনুবর্তন করে সার্থকতা লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটি চচ্চড়ি, এ সবতাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টোতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি।"[২৩]

বক্তব্যের নিহিতার্থ এই যে, বিভিন্ন লোক রুচি, প্রবণতা এবং

২৩ কথামৃত, ২।১৫।১

সহ্যক্ষমতা অনুসারে যেমন মাছের বিভিন্ন রকম রান্না গ্রহণ করে, তেমনি সাধকেরাও রুচি, প্রবণতা এবং অধিকার অনুসারে বিভিন্ন সাধন-পথ অনুসরণ করেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সমস্ত সাধন-পথেই সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী। তিনি মাছের সমস্ত রকম রান্নাই পছন্দ করেন। এই দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ধর্ম ও মতের সমন্বয়ের প্রচার শুধু তত্ত্বের মধ্য দিয়েই করেননি, জীবন দিয়েও করেছিলেন। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের শুধু প্রবক্তা নন, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ঋষি। এতদিন যা আমরা তত্ত্বের দিক থেকে জেনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বলে আমাদের কাছে প্রচার করেছেন। এই দিক থেকে তাঁর অবদান অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়।

সব তত্ত্বই এবং সব পথই সত্য বলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সাকার উপাসনা এবং ভক্তির পথই সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি নিজেও সমস্ত রকম উপাসনা ও সমস্ত পথ অনুসরণ করেও শেষ পর্যন্ত সাকার উপাসনা এবং ভক্তিপথে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভবতারিণীর পূজারী হিসেবেই জানি। তিনি মাতৃসাধক। সার্থক তান্ত্রিক। মা'র কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন—"আমায় শুষ্ক সন্ন্যেসী করিসনে মা"। কখনও তিনি বলেছেন—"শুধু বিচার! থু! থু! কাজ নেই। কেন বিচার করে শুষ্ক হয়ে থাকব?"[২৪] আবার কখনও মা'র কাছে প্রার্থনা করেছেন—"মা, আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ওমা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই কোরো যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি হয় মা।"[২৫]

---

২৪ কথামৃত, ১।৬।৩

২৫ ঐ ২।১১।৬

রামচন্দ্র নারদকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার কাছে বর নাও।' নারদ বল্‌লেন—'আমার আর কি বাকী আছে? কি বর ল'ব? তবে যদি একান্ত বর দেবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' এ উপাখ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই ভক্তদের শোনাতেন এবং বলতেন তিনিও নারদের মতই শুদ্ধাভক্তির ভিখারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি-প্রসঙ্গ আরও বিস্তারিত করে বলছেন—"অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) আছে, লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, রাম! তুমি কত ভাবে কত রূপে থাক, কিরূপে তোমায় চিন্তে পারবো? রাম বল্লেন, ভাই! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উর্জ্জিতা (উর্জিতা) ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উর্জ্জিতা (উর্জিতা) ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়! যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের ঐরূপ হয়েছিল।"[২৬]

আমরা বলি, 'প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়' এতো শুধু চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণেরও এই অবস্থা। রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের যে-কোন পাঠকই জানেন, ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ অবস্থা তো প্রায়ই লেগে থাকতো। তিনি প্রাণের আনন্দে গাইতেন—'দে মা, পাগল করে। আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥' কখনও গাইতেন—

'মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥'

শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, "শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল—কিছুতে তিনি নাই। তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে কিছু

২৬ কথামৃত, ২।১৯।৬

হবে না। ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে। সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥”[২৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ব্যাকুলতা এবং শরণাগতি ঈশ্বরলাভের উপায়। তিনি বলেছেন—‘খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।… ••ডাকার মত ডাকতে হয়।’ শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন—

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তিচন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

ব্যাকুলতা বলতে কি বোঝায় এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ‘তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।’

তিন টান-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ‘কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হ'বে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।’

ব্যাকুল হয়ে ডাকা-র একটি পরিচিত উদাহরণ তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বেড়াল ছানা যেমন করে মা'কে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে তেমনি ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—“বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁসেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হ'লে

---

২৭ কথামৃত, ২।১১।৩

সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"[২৮]

বেড়াল ছানার ডাকে যেমন ব্যাকুলতা আছে তেমনি বেড়াল ছানার একান্ত ভাবে মা'র ওপর আত্মসমর্পনের মধ্যে তার পরিপূর্ণ শরণাগতির পরিচয় রয়েছে। বেড়ালছানার ব্যাকুলতা এবং শরণাগতির অধিকারী হ'তে পারলেই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। ভক্তের ঈশ্বরলাভের উপায় এই ব্যাকুলতা ও শরণাগতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কথা বলতে গিয়ে এই ভক্ত-ভাবই যে তাঁর মুখ্যভাব সেকথা অকপটে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল মা বলে ডাকি। মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়ালছানার স্বভাব। বিড়াল-ছানা কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোটছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য, সে জানে না। জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও জানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয় তো বলে, আমি মাকে বলে দেব, আমার মা আছে। আমারও সন্তানভাব।"[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা, তিনি যে শ্রদ্ধাভক্তির পথিক সে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে শুদ্ধজ্ঞানের কোন তফাৎ নেই। তিনি বলেছেন—"শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক।"[৩০] শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধাভক্তির প্রতি পক্ষপাত তাঁকে নিশ্চিতভাবে শঙ্করাচার্যের প্রতি পক্ষপাতশূন্য করে তুলেছে। শঙ্করাচার্য শিবস্তোত্র রচনা করলেও একান্তভাবে জ্ঞান-

২৮ কথামৃত, ১।১।৫
২৯ ঐ ২।৯।২
৩০ ঐ ১।৭।৫

পথের পথিক। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানপথের সত্যতা স্বীকার করলেও এবং এ পথ অনুসরণ করে সার্থকতা লাভ করলেও ভক্তিপথের প্রতি বেশি আকর্ষণ দেখিয়েছেন। এই দিক থেকে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য স্বীকার করতেই হয়। শুদ্ধজ্ঞান এবং শুদ্ধাভক্তি এক, একথা শঙ্কর কখনই স্বীকার করবেন না। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ভেদ স্বীকার না করলে ভক্তি অর্থহীন। শঙ্করাচার্যের মতে ভেদ পরমার্থতঃ মিথ্যা। একমাত্র জ্ঞানেই অভেদ উপলব্ধ হয়। ভেদভিত্তিক ভক্তি কখনই অভেদ-জ্ঞান-এর সঙ্গে অভিন্ন হ'তে পারে না। এইদিক থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শঙ্করাচার্য-এর পার্থক্য অবশ্য স্বীকার্য।

আমাদের ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণ একপ্রকার অদ্বৈততত্ত্বই প্রচার করেছেন। কিন্তু, এই অদ্বৈততত্ত্ব নিশ্চয়ই লোকপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্ব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈততত্ত্ব অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ এবং বিশেষ করে তান্ত্রিক ধারণার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মতে অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, শিব-শক্তি সবই সত্য। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। একই জিনিস, নামভেদ মাত্র। যেমন জল আর বরফ। জল নিরাকার ব্রহ্ম, বরফ সাকার ঈশ্বর বা কালী। নেতি নেতি করে ব্রহ্মে পৌঁছালে জীব-জগৎ মিথ্যা হয় না, ব্রহ্মই জীবজগৎ হয়েছেন, এই বোধ হয়। শঙ্করাচার্য একথা মানেন না। তাঁর মতে পরমার্থতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ, সগুণ নয় ; সগুণ ব্রহ্ম মিথ্যা। জীব ও জগৎ পরমার্থতঃ মিথ্যা। উপলব্ধির সর্বশেষ স্তরে নির্গুণ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ তা মানেন না। শঙ্করের মতে শক্তি পরমার্থতঃ মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, দুইই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য উপলব্ধিনির্ভর। শঙ্করাচার্যও উপলব্ধির উপরই গুরুত্ব দেন। দুজনের উপলব্ধির মধ্যে শেষ পর্যন্ত যে কিছু পার্থক্য থেকে যাচ্ছে একথা স্বীকার না করলে সত্য অস্বীকার

করা হবে। তবে শঙ্করাচার্য তাঁর বক্তব্য যুক্তিতর্কের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে যেমন দর্শনাকারে প্রচার করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেননি। তিনি দার্শনিক হ'তে চাননি, কোন দর্শনসৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। তিনি সাধক। তাঁর অখণ্ড দৃষ্টিতে তিনি যা দেখেছেন তা-ই বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এমন এক সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, যা সাকার, নিরাকার এবং আরও কত কি। এই সত্যকে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি বিকল্প প্রত্যয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্যই বিভিন্ন বিকল্প একই সত্যের প্রকাশক। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত তত্ত্ব বা সত্য একই সঙ্গে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, প্রভৃতি প্রত্যয়ের সমন্বিত রূপ নয়, ইহা সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ প্রভৃতি বিকল্পের মধ্যে প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণের চরম তত্ত্ব বা সত্য কোন সমন্বিত তত্ত্ব বা সত্য (Synthetic Reality) নয়, ইহা বিকল্পে প্রকাশিত অদ্বৈত তত্ত্ব (A Reality expressed in altrnative forms)। জল যেমন কখনও তরল আবার কখনও কঠিন (যেমন বরফ) তেমনি একই সত্য কখনও নিরাকার, কখনও সাকার, কখনও নির্গুণ, কখনও সগুণ। কিন্তু, জল যেমন একই সঙ্গে তরল ও কঠিন হয় না, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈততত্ত্ব ও সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ সমস্ত কিছুরই সমন্বিত প্রকাশ নয়; সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি তাঁর বিকল্প প্রকাশ মাত্র। সাধকেরা তাঁদের রুচি, প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য একই সত্যকে বিভিন্ন বিকল্পের মাধ্যমে দেখেন। কোন বিকল্পই মিথ্যা নয়, সুতরাং বর্জনীয় নয়। সমস্ত সাধকেরাই বিভিন্ন বিকল্প-পথে বিভিন্ন নদীর মত একই সত্য—সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সেখানেই তাঁদের যাত্রার শেষ, পরমা প্রাপ্তি ও পরমা তৃপ্তি।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

বাংলার বৈষ্ণব-সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

বাংলা দেশের সজল পলিমাটিতে যে কয়টি সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে তাদের সব কয়টিই পলির সম্পদে ঋদ্ধ হয়েছে। হৃদয়ের ভাব-মাধুর্য্য বাংলার সব কয়টি সাধনাকেই মধুর ও সরস করে তুলেছে। বাংলার মাতৃসাধনা, বৈষ্ণব সাধনা এবং বাউল প্রভৃতি মরমিয়া সাধনা সবই যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের পথ ছেড়ে অন্তরের গভীর ও নিবিড় অনুভূতির আশ্রয় নিয়েছে। ভক্তি বা প্রেমের পথ এদের সকলেরই চলাচলের অত্যন্ত প্রিয় পথ। আমরা পূর্বে বাংলার মাতৃসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার পরিচয় দিয়েছি। এবার বৈষ্ণব সাধনার আলোচনার আলোতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার মর্ম গ্রহণের চেষ্টা করবো।

প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ-লিখিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন' প্রাচ্যবাণী মন্দির থেকে প্রকাশ-কালে প্রকাশকের নিবেদনে বলেছেন—"গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশের প্রাণস্বরূপ। এই সার্বজনীন পরম-ধর্মের পুণ্যপ্রবাহে বাংলা দেশের সংস্কৃতির সকল দিকই যে ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার তুলনা জগতের ইতিহাসে স্বল্প।"[১] বক্তব্য যথার্থ বলেই আমাদের মনে হয়।

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সাধনা প্রধানতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-এর বাণী ও জীবন ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বাংলার বৈষ্ণব সাধনার মুখ্য আচার্য্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের

---

১ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন', ।৶৹ পৃষ্ঠা

কাছে নীলাচলে এবং বারাণসীতে প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর কাছে ব্রহ্ম-সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এই ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই মহাপ্রভু ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব এবং সাধ্যতত্ত্ব সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করেন। প্রয়াগে রূপ-গোস্বামীকে এবং বারাণসীতে সনাতন গোস্বামীকেও মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। মহাপ্রভুর এই শিক্ষা থেকেও বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে মহাপ্রভুর অভিমত জানা যায়। মহাপ্রভুর এ সমস্ত অভিমত ভিত্তি করেই বাংলার বৈষ্ণব দর্শন গড়ে উঠেছে।[২]

রূপ গোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং সনাতন গোস্বামী তাঁর 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে' এবং 'শ্রীমদ্‌-ভাগবতে'র দশম-স্কন্দের টীকা প্রভৃতিতে মহাপ্রভুর শিক্ষারই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীও শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকাতে মহাপ্রভুর মতই প্রচার করেছেন। মহাপ্রভুর উপদেশের ভিত্তিতে জীব গোস্বামী 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ' নামে একটি দার্শনিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি ছয়টি সন্দর্ভে বিভক্ত বলে একে ষট্‌সন্দর্ভও বলা হয়। এই ছয়টি সন্দর্ভের নাম—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ। এই ষট্‌সন্দর্ভই বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ।

ষট্‌সন্দর্ভ ছাড়া জীব গোস্বামী 'সর্বসম্বাদিনী' নামে আরও একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সর্বসম্বাদিনী ষট্‌সন্দর্ভ-এরই পরিশিষ্ট। এই গ্রন্থে জীব গোস্বামী শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করেছেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদই বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা।

২ 'শ্রীমনমহাপ্রভুর উপদিষ্ট বা কথিত তত্ত্বাদিই হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি'—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ১ম খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

মহাপ্রভু বা তাঁর কোন শিষ্যই ব্রহ্মসূত্রের সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করেননি। তাঁরা মুখ্যসূত্রগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। একমাত্র সর্বসম্বাদিনীতেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সূত্রের (১১৫টি) ভাষ্য রচনা করা হয়েছে।

রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে শিক্ষা গ্রহণান্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' নামে একটি কবিতাগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এ গ্রন্থকে বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের আকর গ্রন্থ বলা হয়। এ গ্রন্থে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত-বিচার এবং রূপ সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর বিভিন্ন উপদেশও বিবৃত হয়েছে।

পরবর্তীকালের লেখক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ মুখ্যতঃ তাঁদের লেখায় পূর্ববর্তী গোস্বামীগণের মতই অনুসরণ করেছিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ভাষ্যের নাম গোবিন্দ-ভাষ্য। এ ছাড়াও তিনি সিদ্ধান্ত-রত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। আমরা এ সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যের গ্রন্থ অনুসরণ করে অতি সংক্ষেপে বৈষ্ণব-দর্শন-এর মূল কথা প্রকাশ করবো।

(২)

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন—"অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব—এ সমস্ত হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য"।[৩] আমরা এ বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়েই বাংলার বৈষ্ণব মতের পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

---

৩ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন, ভূ-১৫২ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যদের পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। এঁদের সকলেরই মতে ব্রহ্ম সগুণ, অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, পরম করুণাময় ঈশ্বর।

বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বিশেষভাবে ব্রহ্মের শক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এঁদের মতে ব্রহ্মের প্রধানতঃ তিনটি শক্তি—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এ তিনটি শক্তির আবার অনন্ত বৈচিত্র্য।

এ তিনটি শক্তির মধ্যে চিৎশক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে একে পরাশক্তি বলা হয়। এই চিৎশক্তি আবার ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত বলে স্বরূপ শক্তি নামেও পরিচিত। এই শক্তির সাহায্যেই ব্রহ্ম তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা করেন বলে একে অন্তরঙ্গ শক্তিও বলে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করে না।

স্বরূপ শক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের 'সৎ' অংশের শক্তি বা আধার শক্তি। এ শক্তির সাহায্যে ব্রহ্ম তাঁর নিজের এবং অন্যের সত্তা রক্ষা করেন। সম্বিৎ 'চিৎ' অংশের শক্তি; এর দ্বারা তিনি নিজে জানেন এবং অন্যকে জানান। হ্লাদিনী 'আনন্দ' অংশের শক্তি; এর সাহায্যে তিনি স্বয়ং আনন্দ অনুভব করেন এবং অন্যদের করান। স্বরূপ শক্তির এ তিনটি বৃত্তি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, তবে তাদের পরিমাণের তারতম্য হয়। স্বরূপ-শক্তিতে যখন হ্লাদিনীর প্রাধান্য থাকে, তখন তাকে হ্লাদিনী-প্রকাশ-স্বরূপ শক্তি এবং সাধারণতঃ হ্লাদিনী বলা হয়। সন্ধিনী এবং সম্বিৎ বৃত্তি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযুজ্য।

ব্রহ্মের জীবশক্তির অংশই অনন্ত কোটি জীব। মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, সর্বদাই ব্রহ্মের বাইরে থাকে। এজন্য একে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। বাহ্য জগৎ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির স্থান।

দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী

বাংলার বৈষ্ণবাচার্যদের মতে ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ। আনন্দ পরম আস্বাদনের বিষয়। এ আনন্দ যখন অনির্বচনীয় আস্বাদন-গুণ ধারণ করে তখনই তাকে রস বলা হয়। 'রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসোরসঃ।' ব্রহ্ম নিত্য অনির্বচনীয় আস্বাদন-গুণ যুক্ত আনন্দ বলেই রস-স্বরূপ নামে খ্যাত। 'রস' শব্দের দুটো অর্থ। 'রস' বলতে চমৎকার ও উপাদেয় আস্বাদ্য বস্তু বোঝায় আবার উপাদেয় রস যিনি আস্বাদন করেন সেই রসিক পুরুষকেও বোঝায়। রস স্বরূপ পরব্রহ্ম যেমন চমৎকার অতি অপূর্ব আস্বাদ্য বস্তু, তেমনি তিনি আবার অতুলনীয় রস-আস্বাদক, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। তিনি আস্বাদন করেন— স্বীয় স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ—শক্তির আনন্দ।

ব্রহ্ম লীলাময়। সৃষ্টি তাঁর এক লীলা। বহিরঙ্গা মায়ার যোগে সৃষ্টি-লীলা তাঁর বহিরঙ্গা লীলা। ব্রহ্মের অন্তরঙ্গ লীলাও আছে। বাংলার বৈষ্ণবাচায্যদের ধারণা, লীলার জন্য ব্রহ্মের লীলার স্থান বা ধাম এবং লীলা-পরিকর প্রয়োজন।

ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি তাঁর লীলা-পরিকর রূপে অনাদিকাল থেকে বিরাজিত আবার তাঁর স্বরূপশক্তিই (সন্ধিনী প্রধানা স্বরূপশক্তি) তাঁর ধাম নামে পরিচিত। ব্রহ্মের পরিকরগণ সাধারণ জীব ন'ন, তাঁরা সকলেই অনাদি এবং স্বরূপশক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর ধামও অপ্রাকৃত, চিন্ময় এবং নিত্য। মায়া ব্রহ্মের ধাম এবং ধামের কোন বস্তুই স্পর্শ করতে পারে না। আমাদের দৃশ্য জগতে যে সমস্ত বস্তু থাকে, ভগবানের ধামেও প্রায় সে সমস্ত বস্তুই রয়েছে। তবে দৃশ্য জগতের বস্তুর প্রকৃতি এবং ধামের বস্তুর প্রকৃতি এক নয়। ধামের বস্তু সবই অপ্রাকৃত, চিন্ময় এবং ব্রহ্ম-লীলার সহায়ক।

পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হলেও অনন্তরূপে তিনি প্রকাশিত। বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, সদাশিব প্রভৃতি তাঁরই বিভিন্ন

প্রকাশ। এঁরা সকলেই পূর্ণ, নিত্য এবং সচ্চিদানন্দ। এঁদের পার্থক্য শুধু শক্তি বিকাশের তারতম্যে। পরব্রহ্মে সর্বশক্তি এবং রসের পূর্ণতম প্রকাশ, অন্যান্য ক্ষেত্রে শক্তির এবং রসের বিকাশ কম।

বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের এক প্রকাশ। তবে এ প্রকাশে স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি সবচেয়ে কম। এ ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি এবং তার কার্য্যের সম্যক্ প্রকাশ নেই বলে এঁকে অসম্যক্ প্রকাশও বলা হয়। গীতায় 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্' বাক্যে এই নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথাই বলা হয়েছে।

নির্বিশেষ ব্রহ্মের চেয়ে জীবেশ্বর পরমাত্মাতে শক্তির বিকাশ বেশী। এজন্যই পরমাত্মা মূর্ত। শ্রুতি পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে পরমাত্মা প্রাদেশ প্রমাণ, চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। কিন্তু পরমাত্মায় ঐশ্বর্য্যের বিকাশ নেই।

বৈষ্ণবাচার্য্য রাধাগোবিন্দ নাথ বলেছেন—"ব্যাপক অর্থে 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা'—এই শব্দদ্বয় পরব্রহ্মকে বুঝাইলেও রূঢ়ি-অর্থে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবান্তর্য্যামীকেই বুঝায়।"[৪]

জীবেশ্বর পরমাত্মা থেকেও শক্তির অতিরিক্ত বিকাশ হ'লে ঐশ্বর্য্য বা ভগবত্ত্বা প্রকাশিত হয়। পরব্রহ্মের যে সমস্ত প্রকাশে এই ভগবত্ত্বা প্রকটিত, তাঁদের 'ভগবান' বলা হয়। ভগবত্ত্বা প্রকাশেরও অনন্ত বৈচিত্র্য সম্ভব, তাই ভগবৎ-স্বরূপ অনন্ত। পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান, তাঁর মধ্যেই ভগবত্ত্বার পূর্ণতম প্রকাশ।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে 'রসো বৈ সঃ' এবং 'সর্বরসঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা এই দু'টি বাক্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, পরব্রহ্ম অনন্ত রসের আধার। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ পরব্রহ্মের অনন্ত রসবৈচিত্র্যের বিভিন্ন মূর্তরূপ। রস পরব্রহ্মের

৪ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূ-১৩২।

স্বরূপগত বলে তাঁর প্রত্যেক প্রকাশেই রস-এর অবস্থান। পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশে যেমন শক্তির বিকাশের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি রস-এর অবস্থানেরও তারতম্য রয়েছে এ সমস্ত প্রকাশে। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম তাঁর অন্তহীন প্রকাশের মধ্যে নিজ রসবৈচিত্র্য আস্বাদন করে থাকেন। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই লীলা, ধাম এবং লীলাপরিকর রয়েছে। রস-বৈচিত্র্যের যে রূপটি যে ভগবৎ-স্বরূপে মূর্ত হয়েছে সে ভগবৎ-স্বরূপ যেমন সে রস আস্বাদন করেন, তেমনি স্বরূপানন্দও উপভোগ করেন, আবার তাঁর পরিকরদের সঙ্গে লীলাতে উৎসারিত শক্ত্যানন্দও সম্ভোগ করে থাকেন। ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম স্বরূপ-শক্তির একটি বিলাস, পরিকর ভক্তগণকে আশ্রয় করেই তা বিলসিত হয়। নিবিড়তা এবং গভীরতা অনুসারে এ প্রেমেরও অনন্তরূপ। লীলাকালে পরিকর ভক্তের চিত্ত থেকে এই প্রেমরস উৎসারিত হয়। এই রসাস্বাদনের আনন্দকেই শক্ত্যানন্দ বলা হয়।

স্বয়ং ভগবান পরব্রহ্মের ধামের নাম গোলোক বা ব্রজ। দ্বারকা-মথুরা বাসুদেবের ধাম। নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদির ধামসমূহের সমবেত নাম পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। মহাবৈকুণ্ঠস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে শক্তির বিকাশ সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় নারায়ণের মধ্যে। এজন্যই নারায়ণকে বৈকুণ্ঠাধিপতি বলা হয়। ইনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই নিজ ধামে নিজ পরিকরদের সঙ্গে লীলা করে থাকেন। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ বলে এঁদের লীলা আসলে পরব্রহ্মেরই লীলা। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের মধ্য দিয়ে পরব্রহ্মই বিচিত্র রস-লীলা, বিচিত্র শক্ত্যানন্দ এবং স্বরূপানন্দ উপভোগ করে থাকেন।

লীলাবিলাসী পরব্রহ্মের দুরকমের লীলা—প্রকট ও অপ্রকট। যখন তিনি আপনার লীলাবিলাস বিশ্বে প্রকাশিত করে বিশ্ববাসীর

নয়নগোচর করেন তখন তাকে বলে প্রকটলীলা, আর যখন তিনি লোকলোচনের অন্তরালে আপনার লীলামাধুরী বিস্তার করেন তখন তাকে বলে অপ্রকট লীলা। প্রকটলীলাতে তাঁর ধাম প্রকটিত হয় এ বিশ্বেই, পরিকবদেব নিযে লীলাও করেন তিনি এখানেই। তখন তিনি এবং তাঁব পরিকবদেব সবাই এক স্বরূপে প্রকট-লীলায় এবং অন্য স্বরূপে অপ্রকটলীলায় বিহার করেন।

বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বয়ং ভগবান পবব্রহ্মের করুণা-গুণেব খুব জযগান করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বলেন—"স্বয়ং ভগবান রসস্বরূপ পরব্রহ্মের শাস্ত্রবিহিত একটি অতি লোভনীয গুণের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি উজ্জ্বলভাবে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গুণটি হইতেছে ভগবানেব করুণা। ভগবানের অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে করুণাই হইতেছে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ।"[৫]

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, পরব্রহ্মের এগুণ আছে বলেই জীবের পক্ষে তাঁর প্রসাদ-লাভ সম্ভব হয়। পরব্রহ্ম করুণা কবে তাঁর পরিচয জীবের কাছে প্রকাশ করেন। উপনিষদও বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈষ লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।

ভগবানের করুণার কোন অন্ত নেই। তিনি করুণাঘন। এত তাঁর করুণা বলেই ত তিনি যা কিছু করেন সবই ভক্তের জন্য। তিনি নিজেই বলেছেন—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।"[৬] ভক্ত যেমন ভগবানের প্রীতি-ভিখারী, ভগবানও তেমনি ভক্তের প্রীতির অভিলাষী। আসলে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম ও প্রীতি পারস্পরিক। নিজের জন্য ভক্ত যেমন চাননা কিছু, ভগবানও

---

৫ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয বৈষ্ণব দর্শন, ভূ ১৩৪।

৬ পদ্মপুরাণ

কিছুই চাননা। ভগবান ত পূর্ণ পুরুষ। তাঁর কোন অপূর্ণতা নেই। সুতরাং তাঁর চাইবার কিছু থাকতে পারে না। তিনি ভক্তের প্রতি করুণা-পরবশ হয়েই তার সেবা গ্রহণ করেন। যদি তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণ না করেন তবে ভক্ত যে দুঃখ পাবে। করুণাময় ভগবান ভক্তের দুঃখ সইতে পারেন না। তাই তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের অনন্ত করুণা বলেই ত দুঃখকাতর জীবের দুঃখতারণে তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত।[৭] করুণার বশবর্তী হয়েই তিনি বেদ-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের মাধ্যমে জীবোদ্ধারের মন্ত্র প্রচার করেছেন। করুণা-বিগলিত হয়ে যুগে যুগে ধর্মের গ্লানি দেখা দিলে সাধুর পরিত্রাণের জন্য এবং ধর্ম স্থাপনের জন্য[৮] তিনি এই মাটির পৃথিবীতে নামেন। জীবের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যই তিনি ব্যাকুল। তাই তিনি বলেছেন—"প্রীতির সঙ্গে যে আমার ভজনা করে আমি তার এমন বুদ্ধিদান করি যে সে আমাকে পেয়ে ধন্য হয়।"[৯]

বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে দ্বিভুজ, গোপবেশ ও মুরলিধারী বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। তাঁরা বলেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। নরদেহ ধারণ করে কংসের কারাগারে আবির্ভূত হলেও তিনি সমস্ত শক্তি, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ। ব্রজের কেবলা প্রীতির রসাস্বাদনের জন্যই তাঁর নরদেহ ধারণ। সব চেয়ে বড় কথা, নরদেহ ধারণ না করলে তাঁর যে বাৎসল্য রসের আস্বাদন হয় না। পরব্রহ্ম ত অজ, অনাদি। তাঁর পিতা-মাতা থাকতে পারে না। সুতরাং বাৎসল্য রসাস্বাদনের জন্য তিনি ব্রজে নন্দ-যশোদা-নন্দন। বৈষ্ণবচার্য্যদের মতে নন্দ-যশোদা পরব্রহ্ম

---

৭ করুণাবশেই 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব'—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৩।২।৫

৮ 'যদা যদা হি……সম্ভবামি যুগে যুগে'—গীতা ৪।৭-৮

৯ 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে'—গীতা ১০।১০

শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী প্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, গভীর বাৎসল্য রসের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর। শ্রীকৃষ্ণ-জীবন আসলে পরব্রহ্মের মর্ত্যলীলা। এই লীলায় পরব্রহ্ম তাঁর নিত্য সিদ্ধ পরিকর নন্দ-যশোদাকে পূর্বে মর্ত্যে প্রেরণ করে তাঁদেরই ঘরে আবির্ভূত হয়ে নরলীলায় বিশ্ববাসীর আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। এই মর্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ চার ভাবের পরিকরদের সঙ্গে লীলাবিহার করেছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (কান্তাভাব) শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলায় চার ভাব। বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর রসের নিবিড়তা ও গভীরতা বেশী। অর্থাৎ দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরভাবে রসাস্বাদন বেশী হয়ে থাকে।

বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে 'শান্তরস ব্রজের বস্তু নহে', শান্তরসের স্থান বৈকুণ্ঠে। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। বৈকুণ্ঠ-ধামে 'শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ববোধ সম্যক জাগ্রত, এজন্য বৈকুণ্ঠে তাঁর পরিকরদের মধ্যে পিতা মাতা নেই, সে ধামে বাৎসল্য রস ও নেই।

পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান রূপেই শ্যামকৃষ্ণ ও গৌরকৃষ্ণ এ দুই রূপে প্রকাশিত। শ্যামকৃষ্ণ ব্রজবিহারী নন্দের নন্দন, আর গৌরকৃষ্ণ নদের নিমাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। এই দুই রূপেরই প্রকট এবং অপ্রকট দু'রকমের লীলাই রয়েছে।

বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতই নিম্বার্কাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রজবিহারী নন্দের নন্দনকেই পরব্রহ্ম বলেন। কিন্তু রামানুজাচার্য্য এবং মধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণই পরব্রহ্ম, এই মত প্রকাশ করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এই প্রসঙ্গে বলেন—"পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সহিত শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্যের মতভেদ থাকিলেও ইহাকে আত্যন্তিক বিরোধ বলা যায় না; কেননা, তত্ত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণে ও

নারায়ণে ভেদ কিছু নাই। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণেরই এক প্রকাশ, পারিভাষিক ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।'[১০]

পরব্রহ্মের যে সমস্ত প্রকাশের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তাদের সবাই মায়া বা মায়ের গুণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অবশ্য এছাড়া আর ও ভগবৎস্বরূপ আছেন এবং এঁরা মায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মায়া ছাড়া সৃষ্টি হয় না। যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সঙ্গেই মায়ার যোগ লক্ষ্য করা যায়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মায়াসংযুক্ত ভগবৎস্বরূপ নামে খ্যাত। রজোগুণের সাহায্যে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণের দ্বারা বিষ্ণু বিশ্ব পালন করেন এবং তমোগুণের সাহায্যে শিব বিশ্ব-সংহার করেন। এঁরা গুণময়; তবে সংসারী জীবের মত গুণময়ী মায়ার বশীভূত নন, এঁরা গুণের বা গুণময়ী মায়ার নিয়ন্তা। জগতের সৃষ্টি, রক্ষা এবং ধ্বংস-এর কর্তৃত্ব আসলে পর পরব্রহ্মের হলেও তিনি সাক্ষাৎভাবে এ সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত ন'ন, তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ পূর্বে আলোচিত ভগবৎস্বরূপদের দ্বারা এ সমস্ত কাজ করিয়ে থাকেন।

রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিবাদীদের মতই বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যেরা জীব স্বরূপতঃ অণুপরিমানও চিৎকণাতুল্য বলে মনে করেন। মোক্ষ অবস্থাতেও জীবের পৃথক অস্তিত্ব থাকে, একথা এঁরা সবাই বলেন। বাংলার বৈষ্ণব মহাজনদের মতে জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ, চিদ্রূপ। জীবশক্তি চিদ্রূপ হলেও পূর্বকথিত চিৎশক্তি বা স্বরূপ শক্তি নয়, জীবে স্বরূপশক্তি থাকেও না। জীব ভগবান পরব্রহ্মের চিৎকণ অংশ, জীবশক্তি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ। জীব সংখ্যায় অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, আবার জ্ঞাতা ও কর্তা। জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন। জীব ব্রহ্মের ভেদাভেদ প্রকাশ এবং স্বরূপতঃ

১০ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূ ১৩৫

নিত্যই কৃষ্ণের দাস। বহির্মুখীতাই জীবের বন্ধনের কারণ। ভগবৎ-ভজনে জীব বন্ধন মুক্তি লাভ করে স্বরূপে অবস্থান করতে পারে।

রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিবাদীদের মতই বাংলার বৈষ্ণবাচার্য্যেরা পরব্রহ্মকেই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ বলে মনে করেন। এঁদের মতে পরব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর কারণ; জগৎ মিথ্যা নয়, সত্য।[১১] তবে এঁরা সকলেই জগতের অনিত্যতা স্বীকার করেন। বাংলার বৈষ্ণব মহাজনেরা কার্য্য-কারণ ক্ষেত্রে পরিণামবাদ প্রচার করেন। তাঁদের মতে কারণ কার্য্যে পরিণত হয়। দুধ থেকে যখন দৈ হয় তখন দুধ সত্যিই দৈ-এ পরিণত হয়। ব্রহ্মও জগতে পরিণত হ'ন, তবে পরিণত হয়েও তিনি অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অবিকৃতই থাকেন। বাংলার বৈষ্ণববাদীদের ধারণা, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতে পরিণত হয়, সেজন্যই জগৎসৃষ্টিতে ব্রহ্মের কোন বিকৃতি দৃষ্ট হয় না। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। শক্তি আর শক্তিমানে ত কোন ভেদ নাই। সুতরাং মায়ার পরিণাম ও যা ব্রহ্মের পরিণাম ত তাই।

জীব ও জগৎ-এর সঙ্গে ব্রহ্মের যথার্থ সম্পর্ক কি, এ বিষয়ে বাংলার বৈষ্ণবাচার্যদের বক্তব্য বুঝতে হ'লে অন্যান্য বৈদান্তিকেরা এ বিষয়ে কি বলেন তা জানা দরকার বলে মনে করি। আমরা অতি সংক্ষেপে অন্যান্য বৈদান্তিকদের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষ্ণব মত আলোচনা করবো।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। বৈষ্ণবাচার্য্য জীব গোস্বামী এ মত খণ্ডন করেছেন।[১২]

মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। তাঁর মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের আত্যন্তিক ভেদ বর্তমান। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা এমতও গ্রহণ করেন না।

১১ তদবৎ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪-১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

১২ 'জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়'—শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৫৭

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক শরীরীর সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক। ব্রহ্ম যেন শরীরী বা দেহী এবং জীব ও জগৎ যেন তাঁর শরীর বা দেহ। আসলে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্পর্ক অংশী-অংশ এর সম্পর্ক। রামানুজ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ অংশ বিশিষ্ট অংশী। ব্রহ্মের চিৎ-অংশ থেকে জীব আবির্ভূত এবং জগৎ অচিৎ অংশ-এর পরিণতি। বাংলার বৈষ্ণবাচার্যেরা এ-মতও স্বীকার করেন না।[১৩]

ভাস্করাচার্য ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। তাঁর মতে —জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের যেমন ভেদও আছে, তেমনি অভেদও আছে। অভেদ স্বাভাবিক কিন্তু ভেদ ঔপাধিক। কারণ রূপে ব্রহ্মে ও জীব জগতে অভেদ। ভাস্কর মতে—অবিদ্যা-কাম-কর্মময় উপাধি। এই উপাধিই অসীম ব্রহ্মকে সসীম জীবরূপে পরিণত করে। সুতরাং জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ অবিদ্যাকাম কর্মময় উপাধির জন্য। এই মতবাদকে ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ বলে। বাংলার বৈষ্ণবাচার্যেরা এ-মত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন না।

নিম্বার্কাচার্য স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী। তাঁর মতে-ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের ভেদও স্বাভাবিক, আবার অভেদও স্বাভাবিক। কারণ-এর সঙ্গে কার্যের, মৃৎ পিণ্ডের সঙ্গে ঘট প্রভৃতির অভেদও যেমন স্বাভাবিক ভেদও তেমনি স্বাভাবিক। কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে কার্য জীব ও জগতের ভেদ ও অভেদ দুইই স্বাভাবিক।

বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। জীব গোস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি। এর কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীরাধা-

১৩ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, চতুর্থ খণ্ড, ৬, ২০ ও ২৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ নাথ বলেছেন—' শ্রীপাদ জীবের সময়ে বল্লভাচার্যের মতবাদ বোধ হয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।'[১৪] তবে জীব গোস্বামীর বক্তব্য অনুসরণ করলে এ-মত যে তাঁর অভিপ্রেত নয় তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

জীব গোস্বামীর মতে—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রুতি-স্মৃতি এবং ন্যায় এই প্রস্থানত্রয় সমর্থিত। গোস্বামী প্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব দিয়ে কেবলমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্কই প্রকাশ করেননি, ব্রহ্মের সঙ্গে ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধাম-এর দ্রব্য, ভগবৎ-পরিকর, ভগবৎ স্বরূপ প্রভৃতির সম্পর্কও ব্যাখ্যা করেছেন।

জীব গোস্বামী বলেন, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির যে সম্পর্ক, ব্রহ্মের সঙ্গে জীব, জগৎ প্রভৃতির সেই সম্পর্ক ; জীব, জগৎ প্রভৃতি স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি।

জীব ব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ—সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি। জগৎ ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। ভগদ্ধামসমূহ ব্রহ্মের চিৎশক্তির অভিব্যক্তি, ভগবৎ পরিকরগণ ব্রহ্মের চিৎশক্তির বা স্বরূপ শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। কাজেই সব কিছুই স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি বলে তাদের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়।

শক্তি ও শক্তিমানের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে জীব গোস্বামী বলেছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদও নেই, আবার অভেদও নেই, আসলে ভেদ ও অভেদ দুইই আছে। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মধ্যে ভেদ নেই, কারণ যেখানেই অগ্নি সেখানেই তার দাহিকা শক্তি রয়েছে। আবার অগ্নির বহির্দেশেও তার দাহিকা শক্তি বা উত্তাপ অনুভূত হয়, একথাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুইই স্বীকার করতে

১৪ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূ ১৩৮ পৃষ্ঠা।

হয়, অথচ একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদ এই দুই বিপরীত গুণ কি করে থাকে তাও বোঝা যায় না। অর্থাৎ ভেদ ও অভেদের একত্র অবস্থান একটি অচিন্ত্য ব্যাপার। জীব গোস্বামী এই আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করেন, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় তা অচিন্ত্য।[১৫] জীব গোস্বামীর এই তত্ত্বের নামই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। ব্রহ্মের সঙ্গে জীব, জগৎ প্রভৃতির সম্পর্ক প্রসঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবাচার্যদের বিশিষ্ট মত এই তত্ত্বে প্রকাশিত হয়েছে।

জীব গোস্বামী বলেন, ভেদাভেদতত্ত্ব বেদান্তীদের মধ্যে তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়েছে—ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ (ভাস্কর-মত), স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ (নিম্বার্ক-মত) এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ (স্বমত)। তঁরে মতে—ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এই প্রসঙ্গে বলেন—'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বাঙ্গালার—তথা বাঙ্গালীর—এক অপূর্ব গৌরবের বস্তু। বাঙ্গালী দ্বারাই ইহার প্রকটন।'[১৬]

বাংলার বৈষ্ণবাচার্যদের মতে—মায়াবন্ধন থেকে সম্যক অব্যাহতির নামই মুক্তি। বহির্মুখিতাই জীবের বন্ধনের কারণ। মুক্ত অবস্থায় জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন থেকেও পাঁচরকম বিভিন্ন অবস্থার অধিকারী হ'তে পারে। মুক্ত জীবের অবস্থান-ভেদে বাংলার বৈষ্ণবেরা পাঁচ রকম মুক্তির কথা বলেছেন। সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য মুক্তজীবের বিভিন্ন অবস্থান বোঝায়। বাংলার বৈষ্ণবদের

---

১৫ 'স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদ:, ভিন্নত্বেন চিন্তযিতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেকাঙ্গীকৃতৌ, তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি'—জীব গোস্বামী : সর্বসম্বাদিনী—৩৬-৩৭ পৃঃ।

১৬ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, ভূ-১৪১।

মতে—এই পাঁচরকম মুক্তির কোনটাই জীবের পরমপুরুষার্থ নয়। এঁদের ধারণা, ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সবাপ্রাপ্তি বা শুদ্ধাভক্তিই পরম পুরুষার্থ।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু। বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রিয়রূপে তাঁর উপাসনার উপদেশ দিয়েছেন।[১৭] শতপথ ব্রাহ্মণও বলেছেন—'প্রেম্‌ণা হরিং ভজেৎ'—প্রেমের সঙ্গে হরির ভজনা করবে। বাংলার বৈষ্ণবাচার্যদের মতে—'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনা'র নাম প্রেম। প্রিয়রূপে সাধনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, 'প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য হইতেছে—নিজের সম্বন্ধে কোনও কামনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া একমাত্র প্রিয়ের প্রীতিবিধান। পরব্রহ্মই যখন জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু, তখন পরব্রহ্মের প্রীতি-বিধানই হইতেছে জীবের একমাত্র কর্তব্য এবং তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনাই হইতেছে জীবের একমাত্র পোষণের যোগ্য কামনা। ইহাতেই জীবের কৃষ্ণদাসত্ব।'[১৮]

পরব্রহ্ম ভগবান যেমন জীবের প্রিয়, জীবও আবার পরব্রহ্মের প্রিয়। ভক্ত ও ভগবানের প্রীতির সম্পর্ক একান্তভাবেই পারস্পরিক। জীবের সুখ-বাসনা চিরন্তনী। আসলে এ বাসনা জীবের স্বরূপগত ও স্বাভাবিক। এজন্যই সুখ-বাসনা ছাড়া জীবের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। সুখ-স্বরূপ ও রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের সঙ্গে জীব-স্বরূপের নিত্য প্রিয়-সম্পর্ক, সেজন্যই জীবের শাশ্বত সুখ-বাসনা। জীব যখন রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে আপনার করে পান তখনই তিনি সুখ বা আনন্দের অধিকারী হ'ন। তখনই তাঁর সুখ-বাসনা সম্যক পরিতৃপ্তি লাভ

---

১৭ 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত'—বৃহদারণ্যক ১।৪।৮।

১৮ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূ-১৪৩ পৃষ্ঠা।

করে।[১৯] জীবের মায়াজনিত ভীতিও তখন দূর হয়।[২০] জীবের পুনর্জন্ম তখন আর হয়না (মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬)।

বৈষ্ণবাচার্যদের মতে—যে কোন গুণাতীত স্বরূপকে পেলেই পরব্রহ্মকে পাওয়া হয়। তাই যে কোন গুণাতীত স্বরূপ পেলেই জীব আনন্দ লাভ করে। তবে পরব্রহ্মের সকল স্বরূপই সচ্চিদানন্দ হলেও তাঁদের মধ্যে আনন্দ এবং রস বিকাশের তারতম্য আছে। সুতরাং আনন্দ ও রসবিকাশের তারতম্য অনুসারে পরব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপ লাভ করলে জীবের আনন্দ ও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রেও তারতম্য হ'তে বাধ্য। আবার ভগবানের আনন্দ ও রস গ্রহণ করার ক্ষমতাও সকল জীবের এক রকম নেই। তাই ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে অর্থাৎ অধিকারীভেদে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন মাত্রায় রসাস্বাদনের সামর্থ্য লাভ করে। যে ভক্তের মধ্যে প্রিয়রূপে ভগবানকে সেবা করার বাসনা যতটা প্রকাশিত হবে সে ভক্ত ততটা পরিমাণে আনন্দের অধিকারী হবেন।

সাযুজ্য মুক্তিতে সেব্য-সেবক ভাব থাকে না। তাই এই মুক্তিতে ভগবানকে সেবা করার বাসনা থাকা সম্ভব নয়। ব্রহ্মের স্বরূপগত আনন্দের জন্য সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব কিছু আনন্দ নিশ্চয়ই পাবেন, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দ তাঁর করায়ত্ত হবেনা। সালোক্য প্রভৃতি অন্য চার-প্রকার মুক্তিতে সেবা-বাসনা কিছুটা বিকশিত হয়, তবে ঐশ্বর্য জ্ঞানের জন্য তা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে না ; এমন কি ভগবানকে অত্যন্ত আপনার বলে ভাবাও যায় না। তবু সাযুজ্য থেকে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য মুক্তিতে বেশী মাত্রায় আনন্দলাভ সম্ভব এবং সামীপ্য মুক্তিতে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

১৯ 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি'—শ্রুতি।

২০ 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন'—শ্রুতি।

পাঁচপ্রকার মুক্তির যে কোন প্রকারেই জীব নিজের জন্য মুক্তি কামনা করেন। সুতরাং কোন প্রকার মুক্তিতেই নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে একমাত্র ভগবানের প্রীতির উদ্দেশে প্রিয়রূপে ভগবানের উপাসনা করা সম্ভব নয়। সেজন্য বাংলার বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন, মুক্তি পুরুষার্থ হলেও কখনই পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হ'তে পারে না। তাঁদের মতে—ব্রজপ্রেম বা ব্রজবিহারী কৃষ্ণ-প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ। কারণ, কৃষ্ণ-প্রেমে দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনা, স্ব-সুখ-বাসনা, এমনকি মোক্ষ বাসনা পর্যন্ত থাকে না। এমন সর্ববাসনা মুক্ত কেবলা কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার ধন। এ প্রেম এমনই গভীর যে এর মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জ্ঞান প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং এ প্রেমে সেবা-বাসনা জাগ্রত হ'তে পারে। প্রেমের গভীরতায় শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে আপনার করে গ্রহণ করা যায়। তাই প্রাণ ঢেলে প্রিয়তমকে সেবা করে মহত্তম আনন্দের আস্বাদ লাভ সম্ভব হয়। বাংলার বৈষ্ণবাচার্যেরা একেই পরম পুরুষার্থ বলে প্রচার করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে[২১] এই পরম পুরুষার্থের সাধনকেই পরম ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লোকের রুচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন। যিনি যে ভাবে ভগবানকে পেতে চান তিনি সে ভাবেই তাঁকে পেতে পারেন।[২২] সেজন্যই ত বিভিন্ন সাধন-পথের স্বীকৃতি। মুক্তির পাঁচ রূপ এবং কৃষ্ণ-প্রীতি পরম পুরুষার্থ স্বীকার করে বৈষ্ণব সাধকেরা একথাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিকারাও একই রকম প্রেম সেবা কাম্য বলে

---

২১ 'ধর্ম : প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পবমো নির্মৎসবাণাং সতাম্'—শ্রীমদ্ভাগবত, ২নং শ্লোক

২২ গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম।
মম বর্ম্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ৪।১১।

মনে করেননি। শ্রীকৃষ্ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চার ভাবে ব্রজলীলা বিহার করেছেন। কোন ভাবেই দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনা নেই, নেই স্বসুখ-বাসনা, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য জ্ঞানও নেই। সুতরাং এ সমস্ত ভাবেই কৃষ্ণকে একান্ত আপনার করে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবু বৈষ্ণবাচার্যেরা প্রেমের গভীরতার মাত্রা অনুসারে এই চার ভাবের মধ্যেও মমত্ববোধ এবং সেবা-প্রকৃতির তারতম্য স্বীকার করেছেন। দাস্যের চেয়ে সখ্য, সখ্যের চেয়ে বাৎসল্য এবং বাৎসল্যের চেয়ে মধুর প্রেম—গভীরতার আধিক্য প্রকাশ করে। সেজন্যই বৈষ্ণবাচার্যেরা মধুর ভাবকেই পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করেছেন।

রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিবাদীদের মতই বাংলার বৈষ্ণবাচার্যদের মতে—ভক্তিই মোক্ষলাভের বা ভগবৎ-প্রাপ্তির মুখ্য এবং অব্যর্থ পথ। শ্রুতি-স্মৃতি-সমর্থিত কর্ম, যোগ ও জ্ঞান-এর সার্থকতা বৈষ্ণবাচার্যেরা অস্বীকার করেন না। তবে তাঁরা বলেন, কর্ম প্রভৃতি পথ ভক্তির সাহায্যেই সুগম হয় এবং লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারে। ভক্তির সাহায্য ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবে এসব পথ-এর কোন মূল্য নেই। বৈষ্ণবদের মতে—ভক্তি যেমন একটি সাধন-পথ তেমনি তা কৃষ্ণ-প্রীতি রূপে সাধ্যও বটে। সাধ্য ভক্তি ও সাধন ভক্তি দুইই ভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। সাধক নিজের শক্তিতে কখনও মায়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন না। তিনি যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, ঐকান্তিক ভক্তিতে তাঁর ভজনা করেন তবে ভগবান করুণা করে তাঁর মায়াপাশ ছিন্ন করেন। ভগবদগীতায় স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে একথা বলেছেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥'[২৩] ভক্তির সাহায্য ছাড়া কেউ যদি কর্ম বা অন্য পথে মায়াপাশ ছিন্ন করার চেষ্টা করেন তবে তিনি নিজ শক্তিতে মায়া উত্তরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে বিড়ম্বিত হবেন।

২৩ গীতা ৭।১৪।

কর্ম প্রভৃতি সাধন পথের সহায়ক সাধন ভক্তিকে মিশ্রা ভক্তি বলা হয় এবং ফলস্বরূপ কর্মমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শোনা যায়। বাংলার বৈষ্ণব সাধকদের মতে—মিশ্রা ভক্তি দ্বারা পরম পুরুষার্থ প্রেম মেলে না, প্রেম মেলে শুদ্ধাভক্তির সাধনে। শুদ্ধাভক্তিতে কর্ম, যোগ বা জ্ঞান কোন কিছুরই মিশ্রণ থাকে না; এমন কি, মুক্তি-বাসনার লেশ মাত্র থেকে এ ভক্তি মুক্ত। শুদ্ধাভক্তিতে থাকে শুধু পরমকান্ত কৃষ্ণের আন্তরিক প্রেম-সেবার ঐকান্তিক আগ্রহ। এ আগ্রহ নিঃস্বার্থ, নিবিড় ও গভীর ব্যাকুলতা সূচনা করে।

শুদ্ধাভক্তির নয়টি অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।[২৪] শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির উদ্দেশ্যে যখন এ সমস্ত অনুষ্ঠিত হয় তখনই এরা শুদ্ধাভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হ'তে পারে, এ ছাড়া এরা শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ হ'তে পারে না। সাধকের রুচি এবং প্রকৃতি অনুসারে যে কোন একটি অঙ্গের সাধনেই চিত্ত শুদ্ধ হ'তে পারে এবং চিত্ত শুদ্ধ হলেই সেখানে কৃষ্ণ প্রেমের আবির্ভাব হ'তে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন[২৫]—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

শুদ্ধাভক্তির নয়টি অঙ্গের মধ্যে নামসংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।[২৬] বাংলার বৈষ্ণবদের মতে নাম ও নামী ভগবান অভিন্ন, সুতরাং নামী ভগবান যেমন স্বয়ং সম্পূর্ণ নামও তাই। অন্য কোন সাধনাঙ্গই

২৪ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম॥ শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৩-২৪

২৫ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ২।২২।৫৭।

২৬ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। নিরপরাধ নাম হ'তে হয় প্রেমধন॥ ৩।৪।৬৫।

ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন নয়। সুতরাং নাম ভিন্ন অন্য সাধনাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, নাম-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েই এরা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সাধকের চিত্তের অবস্থা অনুসারে সাধন ভক্তি দু'রকম হতে পারে—বৈধী ভক্তি এবং রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রবিধির ভয়ে ভক্ত যে শাস্ত্রবিহিত ভক্তির আচরণ করেন তাকে বলে বৈধী ভক্তি, আর কৃষ্ণ-প্রেমের ঐকান্তিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভক্ত অন্তর থেকে যে ভক্তির অনুশীলন করেন তার নাম রাগানুগা ভক্তি।

বৈধীভক্তির আচরণ করে সালোক্য—সার্ষ্টি—সারূপ্য বা সামীপ্য মুক্তির কোন একটি লাভ করা যায় এবং বৈকুণ্ঠে ভগবানের পার্ষদ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু, এ ভক্তিতে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেম মেলে না। রাগানুগা ভক্তির পথেই পরম পুরুষার্থ লাভ সম্ভব।

রাগানুগা সাধন ভক্তির সার্থকতা ব্রজের নিত্য সিদ্ধ পরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণের মানসিক সেবা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। আমরা আগেই বলেছি, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চার ভাবের লীলা করেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চার ভাবের লীলায় চার ভাবের পরিকর দেখা যায়। যে সাধকের চিত্ত যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তিনি সে ভাবের পরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করে শ্রীকৃষ্ণের মানসিক সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার বৈষ্ণবেরা বলেন, 'নিত্য সিদ্ধ ব্রজ পরিকরদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে সেবা চিন্তা করিলেও ব্রজের প্রেম-সেবা পাওয়া যায় না।'[২৭]

বাংলার বৈষ্ণবদের মতে—ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নদের নিমাই শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ই এক এবং অভিন্ন। উভয় স্বরূপই বাংলার

---

২৭ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূ-১৪৬ পৃষ্ঠা।

বৈষ্ণবদের উপাস্য।[২৮] ভগবানের অসীম করুণায় সাধক যখন সিদ্ধি-লাভ করেন তখন তিনি ব্রজলীলায় এবং নবদ্বীপ লীলায় প্রবেশাধিকার পেয়ে আনন্দরসাস্বাদনের অধিকারও লাভ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব শ্রীরাধা স্বরূপতঃ এক[২৯] শ্রীচৈতন্য বা গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মূর্ত বিগ্রহ।[৩০] সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যে শ্রীকৃষ্ণের মতই পরম পূজনীয় পরমেশ্বর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রেম সাধনা বাংলার বৈষ্ণব সাধনার বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণবাচার্যেরা প্রেম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁদের কথার সার সংকলন করবো।[৩১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-এ প্রেমের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'।[৩২] পরম কান্ত কৃষ্ণের প্রীতি বাসনাই প্রেমবাসনা। বাংলার বৈষ্ণবদের মতে—ভক্তি ও প্রেম সমার্থক। এই প্রেম বা ভক্তি কোন প্রাকৃত বস্তু নয়; ইহা চিদ্ বস্তু। এই প্রেম ভগবানের স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তি বিশেষ। স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বলে এই প্রেম জীবের মধ্যে প্রথম থেকেই থাকে না, কারণ, জীবে স্বরূপ শক্তি নেই। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে এই প্রেম বা সাধ্য ভক্তির আবির্ভাব হ'লেও এ কোন

---

২৮ 'কৃষ্ণলীলামৃতসার তার শত শত ধার
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে
সে গৌরাঙ্গ লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।২৫।২৩।

২৯ 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ'—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।৮।২৩৩।

৩০ 'সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি'—তদবৎ ১।৪।৫০।

৩১ পাঠকেরা এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ লিখিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন'-এর চতুর্থ খণ্ডে পাবেন।

৩২ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১।৪।১৪১।

জন্য পদার্থ নয়। চিদ্‌বস্তু জন্য পদার্থ হতে পারে না, ইহা নিত্য। শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে সেই শুদ্ধ চিত্তে নিত্যসিদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব হয়। মেঘ কেটে গেলে সূর্যের আবির্ভাব হলেও সূর্য যেমন প্রথম জন্মগ্রহণ করে না, তেমনি সাধন ভক্তির দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হ'লে প্রেমের উদ্ভব হয় বলে প্রেমের তখন জন্ম হ'ল একথা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২২।৫৭

বিশুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম প্রথমেই পূর্ণতম রূপে প্রকাশিত হয় না, স্তরে স্তরে একটি পুষ্পের মত বিকশিত হ'তে হ'তে পূর্ণতম রূপ লাভ করে। প্রেমের প্রথম আবির্ভাবকে 'প্রীত্যঙ্কুর' বলে। প্রীত্যঙ্কুর রতি ও ভাব এই দুই নামে পরিচিত।[৩৩] এই রতি বা ভাব ক্রমে গাঢ় হতে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব রূপে পরিণতি লাভ করে। কৃষ্ণদাস করিবাজ গোস্বামী সুন্দর উদাহরণ দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর উক্তিতে বলেছেন—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় 'রতির' উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম—'স্নেহ', 'মান', 'প্রণয়'।
'রাগ', 'অনুরাগ', 'ভাব', 'মহাভাব' হয়॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড় খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥[৩৪]

মহাপ্রভুর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইক্ষুদণ্ডের বীজ থেকে যেমন ইক্ষুদণ্ড হয়, ইক্ষুদণ্ড থেকে রস, রস থেকে গুড়, গুড় থেকে খণ্ডসার,

৩৩ "প্রীত্যঙ্কুরের 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম"—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।২২।৯৪।
৩৪ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।১৯।১৫১-৫৩।

খণ্ডসার থেকে শর্করা, শর্করা থেকে সিতা, সিতা থেকে মিশ্রি এবং মিশ্রি থেকে আবার উত্তম মিশ্রি হয় তেমনি রতি থেকে প্রেম, প্রেম থেকে স্নেহ, স্নেহ থেকে মান, মান থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে রাগ, রাগ থেকে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে ভাব এবং ভাব থেকে মহাভাব হয়। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় এই, স্তরগুলোর ক্রমানুসারে স্বাদাধিক্য উপভোগ করা যায়। অর্থাৎ সাধক যখন ক্রমশঃ রতি থেকে প্রেমে, প্রেম থেকে স্নেহে, স্নেহ থেকে মানে, মান থেকে প্রণয়ে, প্রণয় থেকে রাগে, রাগ থেকে অনুরাগে, অনুরাগ থেকে ভাবে এবং ভাব থেকে মহাভাবে যান তখন ক্রমশঃ তিনি ইক্ষুবীজ থেকে ইক্ষু, ইক্ষু থেকে রস প্রভৃতি যেমন অধিকতর সুমিষ্ট হয় তেমনি অধিকতর রসাস্বাদন লাভ করে ধন্য হন।

রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে মহাভাব দু রকমের বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে—মোদন ও মাদন এই দুই রূপে মহাভাব আত্মপ্রকাশ করে। মাদন রূপেই মহাভাবের চরমোৎকর্ষ। মাদন ভাব একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই বর্তমান এবং এভাবই প্রেমের উচ্চতম স্তর (পরাৎপর)। মাদনের মধ্যে কৃষ্ণ-প্রেম-এর সমস্ত গুরই বর্তমান।

বিধি মার্গের ভজনে বা বৈধী ভক্তিতে ব্রজপ্রেম লভ্য নয়, রাগানুগা ভজনে বা ভক্তিতে ব্রজপ্রেম পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারে না, ব্রজের কেবল প্রেম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতেই লাভ করা যায়।

রসতত্ত্ব বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের একটি অতি উপাদেয় মত। শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হয়েছে। তিনি যেমন মধুরতম আসাদ্য রস বা রসরাজ তেমনি আবার সর্বোত্তম রস-আস্বাদক বা রসিক চূড়ামণি। তিনি স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ শক্ত্যানন্দ নিজে উপভোগ করেন এবং ভক্ত পরিকরদের আস্বাদন করিয়ে থাকেন। রসরাজ এবং রসিক চূড়ামণির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলার

বৈষ্ণবেরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্বার্কাচার্য ও শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলেছেন, কিন্তু তিনি রস সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা বা বিশ্লেষণ করেননি। আমাদের এই নিবন্ধে বাংলার বৈষ্ণবদের রসতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।[৩৫] আমরা সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্যের মূল কথা প্রকাশ করবো।

বাংলার বৈষ্ণবদের মতে—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানন্দ। তিনি আনন্দঘন, রসঘন ও মাধুর্যঘন পুরুষোত্তম। তাঁর মাধুর্য 'কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ'।[৩৬] তিনি যেমন মাধুর্যে নিজের মন হরণ করেন তেমনি সর্বচিত্তও হরণ করেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

'পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥
শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর।
অতএব আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্ত হর॥[৩৭]

যিনি সর্বচিত্তহর তিনি আবার—

'আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥'[৩৮]

বাংলার বৈষ্ণবদের মতে—প্রেম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। এই

৩৫ উৎসাহী পাঠক বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীরাধা-গোবিন্দ নাথ রচিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন'-এর পঞ্চম খণ্ডে দেখতে পাবেন।

৩৬ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।২১।৮৮।

৩৭ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।৮।১১০-১২।

৩৮ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ২।৮।১১৪।

প্রেম-রসের আস্বাদনজাত আনন্দ শক্ত্যানন্দ নামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ এই প্রেমরস-নির্যাসের আশ্রয়। তাঁদের সঙ্গে লীলাকালেই এই প্রেমরস উৎসারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সাহায্যে তিনি নিজে যেমন এই রস আস্বাদন করেন তেমনি তাঁর পরিকরদেরও আস্বাদন করিয়ে থাকেন।[৩৯]

ভক্তাশ্রিত কৃষ্ণরতি পাঁচ প্রকার—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং কান্তারতি বা মধুররতি। পাঁচপ্রকার কৃষ্ণরতির অনুগামী রসও পাঁচ প্রকার—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস, এবং মধুররস।

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলে কৃষ্ণরতি স্বরূপতঃই চরম আস্বাদ্য আনন্দ রূপ। দধি যেমন সিতা, ঘৃত, মরিচ, কর্পূর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে অমৃত-মধুর 'রসালায়' পরিণত হয় তেমনি চরম আস্বাদ্য কৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাব এর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রসরূপে পরিণতি লাভ করে। যার দ্বারা এবং যাতে রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদন করা যায় তাকে বলে বিভাব। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিবিধ—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণরতির বিষয় বলে বিষয়ালম্বন। ভক্তগণের চিত্তেই কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হয় বলে ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। যার দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয় তাকে বলে উদ্দীপন-বিভাব। সাগরের নীল জল নবজলধরশ্যাম-এর স্মৃতি জাগায় বলে নীল জল উদ্দীপন-বিভাব।

কৃষ্ণরতির বহির্লক্ষণগুলোকে অনুভাব বলে। নৃত্য, গীত, ভূমি-লুণ্ঠন প্রভৃতি অনুভাব নামে খ্যাত। অশ্রু, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ,

---

৩৯ "'কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥"—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২।৮।১২০–২১।

স্তম্ভ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য ও মূর্চ্ছা সাত্ত্বিকভাব নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। সত্ত্ব বলতে কৃষ্ণগত চিত্ত বোঝায়। কৃষ্ণগত চিত্ত থেকে উৎসারিত অশ্রু, কম্প প্রভৃতিই সাত্ত্বিক ভাব। অন্য কোন কারণে এ সব লক্ষণ দেখা দিলেও সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হয়েছে বলা যাবে না।

যে সব ভাব স্থায়ী ভাবের দিকে এগিয়ে চলে তাদের ব্যভিচারী ভাব বা সঞ্চারী ভাব বলে। প্রেম থেকে উদ্ভূত নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ভাবকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলে।

বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন, 'সকল রকমের কৃষ্ণরতিতে সকল সাত্ত্বিক ভাব বা সঞ্চারী ভাব সমান রূপে অভিব্যক্ত হয় না। রতির গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে ইহাদেরও বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে, কোনও স্থলে বা কোনওটির অভাবও হইয়া থাকে।'[৪০]

আমরা পূর্বে যে পাঁচটি রসের কথা বলেছি তারাই মুখ্যরস। এ ছাড়া বৈষ্ণবাচার্যেরা সাতটি গৌণ রসের কথা বলেছেন। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় গৌণরস বলে স্বীকৃত।

শান্ত প্রভৃতি পাঁচ প্রকার রতি পাঁচ প্রকার ভক্তকে আশ্রয় করে বিলসিত হয়। শান্তরতির স্থান বৈকুণ্ঠ। ব্রজে শান্তভক্তির কোন পরিকর নেই। বৈকুণ্ঠের পরিকরদের ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে। ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকলেই শান্তরতির আশ্রয় হওয়া যায়।

দ্বারকা-মথুরাতেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতি দেখা যায়, কিন্তু এরা সবাই ঐশ্বর্যজ্ঞান মিশ্রিত, বিশুদ্ধ নয়। দ্বারকার পরিকরদের চিত্তে যখন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যজ্ঞান জন্মে তখন তাঁদের কৃষ্ণরতি সংকুচিত হয়। দারুক প্রভৃতি দ্বারকা-মথুরার দাস্যভাবের পরিকর, অর্জুন সখ্যের, বাসুদেব-দেবকী প্রভৃতি বাৎসল্যের এবং রুক্মিনী প্রভৃতি মহিষীগণ কান্তাভাবের পরিকর।

---

৪০ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ভূ-১৫১।

ঐশ্বর্যজ্ঞান-মুক্ত বিশুদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তারতি একমাত্র গোলোক বা ব্রজেই দেখা যায়। এই ধামে রক্তক-পত্রক প্রভৃতি দাস্য-ভাবের, সুবল-সুদাম প্রভৃতি সখ্যভাবের, নন্দ-যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যভাবের এবং শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণ কান্তাভাবের পরিকর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই পূর্বে আলোচিত চারভাব ও চার রসেরই স্থান রয়েছে। প্রকট লীলাতে কান্তাভাব এবং কান্তরসই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। অপ্রকট লীলায় কান্তা-ভাবময়ী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচরী। এঁদের লীলাতে যে প্রেমরস উৎসারিত হয় তা আত্মভাবময় রস নামে পরিচিত। প্রকট লীলাতে যোগমায়ার প্রভাবে স্বপত্নী গোপীদের মধ্যেই পরকীয়া ভাব সঞ্চারিত হয় এবং এই সঞ্চরণের ফলে যে রসোল্লাস ঘটে তার কোন তুলনা নেই। চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেছেন—'পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।'[৪১] বাংলার বৈষ্ণবদের মতে—সমস্ত ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাব পরকীয়া এবং এই পরকীয়াভাব ব্রজলীলায় শ্রীরাধার মধ্যে যত পরিস্ফুট তত আর কারও মধ্যে হয়নি। সেজন্যই বাংলার বৈষ্ণবদের মতে—শ্রীরাধাভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব।

(৩)

বাংলার বৈষ্ণবদর্শন ও সাধনার মূল কথা আলোচনা শেষ করেছি। আমরা এবার এ-সাধনা রামকৃষ্ণ-সাধনায় কিভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে তা দেখাতে চেষ্টা করবো। রামকৃষ্ণদেব সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধক। তিনি নিজে সমস্ত সাধন-পথেই অগ্রসর হয়ে পরমাপ্রাপ্তির প্রসাদে প্রসন্ন হয়েছেন। মানুষের রুচি প্রকৃতি অনুসারে সমস্ত সাধনার

৪১ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ১।৪।৪২।

সার্থকতা যেমন তিনি স্বীকার করেছেন তেমনি আবার সমস্ত সাধকদের প্রতিও তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন।

বাংলার বৈষ্ণব সাধনার মূল উৎস শ্রীমন মহাপ্রভু সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। একবার চৈতন্যদেবের নামমাহাত্ম্য প্রচার সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তাঁর ফল হ'ল।"[৪২]

চৈতন্যদেবের প্রেম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিস ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস—তাও ভুল হ'য়ে যায়।"[৪৩] একথা বলেই তিনি গাইতে লাগলেন—

সেদিন কবে না হবে?
হরি বল্‌তে ধারা বেয়ে পড়বে
(সেদিন কবে না হবে?)

একদিন গোপী-প্রেম সম্পর্কে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ গোপীদের অনুরাগ-এর খুব প্রশংসা করছিলেন। তখন মাস্টার মহাশয় বললেন—'আজ্ঞে হাঁ, গৌরাঙ্গেরও ঐ রকম হয়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন।'

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—"আহা সেই প্রেমের

৪২ কথামৃত, ১৷৩৷২।
৪৩ ঐ ১৷৮৷৩।

যদি এক বিন্দু কারু হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা। শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা! এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই, তাঁকে ভালোবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো, সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর,—ভগবান মানুষ হ'য়ে অবতার হন, একথা বিশ্বাস কর আর না কর; তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হল। তখন তিনি যে কেমন, নিজেই জানিয়ে দিবেন।"[৪৪]

চৈতন্যদেবকে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার[৪৫] বলে সুস্পষ্টভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায়ই গৌরাঙ্গ প্রেমে মাতোয়ারা অবস্থায় দেখা গেছে।[৪৬] চৈতন্যদেবের সর্বভূতে ভালবাসার প্রশংসা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"ভাল ত বাসবে—সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে। যেমন চৈতন্যদেব।"[৪৭] তিনি আরও বলেছেন—"তাঁর আলাদা কথা তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাত। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গেল, ভিজলো না। সর্বদাই সমাধিস্থ। কত বড় কামজয়ী। জীবের সহিত তাঁর তুলনা!"[৪৮] চৈতন্যভক্ত সম্পর্কেও শ্রীরামকৃষ্ণ সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—"চৈতন্যদেবের ভক্তরা অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে ছিল।"[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের যে কোন সাবধানী পাঠকই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর মতবাদ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য সপ্রশংস উক্তি উদ্ধার

---

৪৪ কথামৃত, ১।১০।৩ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপী প্রেম)
৪৫ ঐ ১।১১।৩।
৪৬ ঐ ২।১৪।৬,৮।
৪৭ ঐ ২।১৭।৪।
৪৮ ঐ ২।২২।৩।
৪৯ ঐ ১।১৩।৬।

করতে পারেন। আমরা কিছু কিছু উক্তি উদ্ধার করেছি। এবার আর একটি উদ্ধার করেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন —"অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড়। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন।"[৫০]

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায়ই কীর্তনানন্দে বিভোর থাকতে দেখা যেত। কথামৃতের যে কোন পাঠকই এ-কথা জানেন। কীর্তন শুনতে শুনতে তিনি প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। একদিন 'আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণনাম' এ-কথা শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরেছিল।[৫১] গৌরাঙ্গের মতই শ্রীরামকৃষ্ণের রাধাভাব হয়েছিল।[৫২] হাসে কাঁদে নাচে গায় প্রেমে মাতোয়ারা—এভাব শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব অবস্থা বাংলার বৈষ্ণব সাধনার আদি গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে প্রতিনিয়তই প্রকাশিত হ'ত। ধর্ম ব্যাপারে চৈতন্যদেবের মতই শ্রীরামকৃষ্ণও জাতিভেদ প্রভৃতির উপর কোন গুরুত্ব দিতেন না এবং কামিনী-কাঞ্চন সাধনার অন্তরায় বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের নির্দেশ ত সুপরিচিত। মহাপ্রভুও যে যোষীৎসঙ্গ করার জন্য যবন হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন তাও সকলেরই জানা আছে। এজন্য অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে চৈতন্যদেবের অবতার বলে মনে করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের প্রথম প্রচারিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন—"এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ংই বলেছেন, "আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন।"[৫৩]

---

৫০ কথামৃত, ৪।৯।৩।
৫১ ঐ ২।২৪।৪।
৫২ ঐ ২।১০।১।
৫৩ ঐ ৩য় ভাগ, পরিশিষ্ট ১ম পরিচ্ছেদ।

অবতারতত্ত্ব একান্তভাবেই ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা। আমরা এ প্রসঙ্গে 'অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে আলোচনা করেছি। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের অবতার ছিলেন কিনা তা যুক্তি-তর্ক করে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবজীবনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল একথা বাস্তব ঘটনা হিসেবে স্বীকার না করে উপায় নেই।

বাংলার বৈষ্ণব সাধনার সার কথা ভক্তিবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি, গোপীপ্রেম, মধুর ভাব প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকদের প্রিয় তত্ত্বগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা ও মাধুর্য স্বীকার করেছেন। আমরা এবার কিছু কিছু উদ্ধৃতি সহযোগে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সবই ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বলে মনে করতেন এবং সুস্পষ্টভাবে 'যার যা পেটে সয়' এ নীতি অনুসারে বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন পথ অনুসরণ আবশ্যক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলতেন—"একই বস্তু। নামভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরমাত্মা; ভক্তের ভগবান।"[৫৪] অনুরূপ কথা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর মুখেও শোনা যায়—'উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা',[৫৫] 'জ্ঞান, যোগ ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান —ত্রিবিধ প্রকাশে।'[৫৬] মহাপ্রভু আরও বলেছেন—'যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।'[৫৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ সব পথের সার্থকতা স্বীকার করেও কলিযুগে সাধারণ

---

৫৪ কথামৃত, ১।২।৩।

৫৫ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ১।২।১৯।

৫৬ তদবৎ ২।২০।১৩৪।

৫৭ তদবৎ ২।৮।৬৫।

লোকের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। কথামৃতে পুনঃপুনঃ একথা বলা হয়েছে। আমরা মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"এযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম-যোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।"[৫৮] মহাপ্রভু এবং বাংলার বৈষ্ণবেরা যে একথাই বলেন তা সকলেরই জানা আছে।

অনুরাগ, ব্যাকুলতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বাংলার বৈষ্ণবদের মতে যেমন কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অব্যর্থ উপায়, শ্রীরামকৃষ্ণও সে-কথা স্বীকার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।...ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও এক সঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"[৫৯] কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিন জনের ভালবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।

অনুরাগে এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বল্লেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বল্লে, কৈ আমরা ত তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বকছো? শ্রীমতী বল্লেন, অনুরাগ অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে। (বিজয়ের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজেরই গান আছে—

প্রভু বিনে অনুরাগ, করে যজ্ঞযাগ, তোমারে কি যায় জানা!

---

৫৮ কথামৃত, ১।১১।৪।

৫৯ ঐ ১।১।৫

এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয় তা হ'লে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।"[৬০] এ প্রসঙ্গে বক্তব্য, বাংলার বৈষ্ণবেরা নিরাকার ঈশ্বর মানেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে—ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। তিনি একবার গোস্বামীদের উপদেশ করে বলেছিলেন—'তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহধারণ করে আসেন, এও সত্য, নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য।'

ঈশ্বরের চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তাঁকে (ঈশ্বরকে) আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।"[৬১]

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের উদাহরণ হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ বেড়াল ছানার কথা বলতেন। তিনি বলেছেন—"বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে—কখনও হেঁসেলে, কখনও মাটির উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"[৬২]

বাংলার বৈষ্ণবেরা সাধনার ক্ষেত্রে সাধকদের যে স্তরভেদ এবং যে সমস্ত ভাববিলাসের ও রসের সার্থকতা স্বীকার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের সারবত্তা স্বীকার করে নিজ ভক্তদের কাছে বিভিন্ন সময়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিশেষ

---

৬০ কথামৃত, ১।৪।৭।

৬১ ঐ ১।১২।৫।

৬২ ঐ ১।১।৫।

সময়ের বিবৃতি তুলে দিচ্ছি। তিনি বলছেন—"বৈষ্ণবেরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে,—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি সবে পথে উঠেছেন তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে—পূজা, জপধ্যান, নাম-গুণ কীর্তন করছে—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে,—অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাবু—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই।

আর এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিদ্ধ। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হলে আর এক রকম অবস্থা—যদি ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম ভক্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে,—যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর। শান্ত— ঋষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা, —সে জানে আমার স্বামী কন্দর্প। দাস্য—যেমন হনুমানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীরও দাস্যভাব থাকে,—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে—যশোদারও ছিল। সখ্য—বন্ধুর ভাব; এস, এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখন এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে! বাৎসল্য—যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে,—স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়।

ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট। যশোদা, কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন। মধুর—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর-ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।"[৬৩]

বৈষ্ণব সাধনার এই স্বীয় সহজ বিশ্লেষণ বৈষ্ণব সাধনার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগের প্রকাশ বলেই মনে করি। বৈষ্ণবদের বিভিন্ন ভাব প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের মত ব্যাখ্যা দিয়ে আরও বলেছেন—"ভক্তি পাকলে ভাব ; তারপর মহাভাব—তারপর প্রেম—তারপর বস্তুলাভ (ঈশ্বরলাভ)। গৌরাঙ্গের মহাভাব, প্রেম। এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়ে পডলো। গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হ'ত।...অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা, আর বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নাম সংকীর্তন করতেন।"[৬৪]

মহাভাব শ্রীমতীর মধ্যেও বিকশিত হয়েছিল। বাংলার বৈষ্ণবদের ধারণা, গৌরাঙ্গের রাধাভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ-ভাব-ব্যাখ্যা বাংলার বৈষ্ণব সাধক-সম্মতই হয়েছে। শ্রীরাধা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করেনা। কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে ; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছুই চায় না।"[৬৫]

বাংলার বৈষ্ণবেরা শুদ্ধাভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর আরাধ্যা জননীর নিকট শুধু শুদ্ধা-

---

৬৩ কথামৃত, ৩।২।২।

৬৪ ঐ ৪।৬।২।

৬৫ ঐ ২।১৪।১।

ভক্তিই প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"মা, আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাইনা মা, ও মা! শতসিদ্ধি চাইনা মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই কোরো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা।"[৬৬]

বাংলার বৈষ্ণবেরা মুক্তির চেয়ে শুদ্ধাভক্তিকে উন্নততর আদর্শ বলে প্রচার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা স্বীকার করে নিয়ে প্রায়ই গাইতেন—

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই (গা)।"[৬৭]

বাংলার বৈষ্ণবেরা জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি এবং শুদ্ধাভক্তি বা প্রেমাভক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং প্রেমাভক্তিকে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একথা স্বীকার করতেন। তিনি 'গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রেমাভক্তি জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির চেয়ে ভাল বলেও "ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয়না,"[৬৮] একথা শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। তাঁর মতে—প্রেমাভক্তি জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির চেয়ে যেমন ভালো তা অর্জন করাও তেমনি কঠিন।

বাংলার বৈষ্ণব সাধকেরা নাম কীর্তনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কলিতে 'নাম কীর্তন' ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই বলে প্রচার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্য স্বীকার করতেন তবে তা-ই মুক্তির একমাত্র পথ এ-কথা তিনি কখনও বলতেন না। সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঋষি এ-কথা বলতেও পারেন না। নাম করলেই ফল হয়না, আন্তরিক ভাবে নাম করা চাই, এ-কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন।

---

৬৬ কথামৃত, ২।১১।৬।
৬৭ ঐ ২।৫।১।
৬৮ ঐ ২।৫।১।

এক গোস্বামীর সঙ্গে কথোপকথন কালে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের এ ধারণার পরিচয় পেয়েছি। প্রাসঙ্গিক অংশটি কথামৃত থেকে তুলে দেওয়া হল—

"গোস্বামী—আজ্ঞা নামেতেই হবে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে। তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনী কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?"[৬৯]

নিত্যরাধা, প্রেমরাধা, কামরাধা বাংলার বৈষ্ণবদের মতে সাধনায় বিভিন্ন স্তর প্রকাশ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"নিত্যরাধা নন্দ ঘোষ দেখেছিলেন। প্রেমরাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, কামরাধা চন্দ্রাবলী। কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাঁজ ছাড়িয়ে গেলে প্রথম লাল খোসা, তারপর ঈষৎ লাল, তার পর সাদা, তারপর আর খোসা পাওয়া যায় না। ঐটি নিত্যরাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হয়ে যায়। নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ। শুদ্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখনও লীলায়। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।"[৭০]

বাংলার বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"বেশ, কিন্তু তাঁতে সব সম্ভবে। সেই তিনিই নিরাকার, সাকার। তিনিই সরাট বিরাট। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি।"[৭১] অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বিত দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে সাকার, নিরাকার, কৃষ্ণ, কালী, God, আল্লা সবই বলা যায়। বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার জন্য ব্রহ্মের

---

৬৯ কথামৃত, ২।২।৫।

৭০ ঐ ৩।২১।৬।

৭১ ঐ ৩।২১।৬।

নামভেদের সৃষ্টি হয়। আসলে এক, দুই নেই। আমরা 'ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত-বাদ কি ভাবে সমস্ত রকমের দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ সমন্বিত করে তা আলোচনা করেছি। এখানে এ বিষয়ে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

জগৎ-প্রসঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবেরা বলেন, জগৎ অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথা স্বীকার করেন বলে আমরা মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে অনিত্য, অবস্তু বলেছেন আবার ঈশ্বর সব হয়েছেন একথাও বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে নেতি নেতি বিচার করে ছাদে পৌঁছতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারী, ইট চূন শুড়কি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগত সমস্ত হয়েছেন।"[৭২]

বিচারের পথে অগ্রসর হলে জগৎ মিথ্যা বলে জ্ঞান হয় একথা শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন ও মানতেন। তবে তিনি বিচারের পথ পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছেন—"শুধু বিচার! থু! থু! কাজ নাই।"[৭৩] অদ্বৈতজ্ঞানের পর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন, এই উপলব্ধি তাঁর খুব ভাল লাগতো। তিনি বলেছেন—"অদ্বৈতজ্ঞানের পর চৈতন্য লাভ হয়। তখন দেখে সর্বভূতে চৈতন্যরূপে তিনি আছেন। চৈতন্য লাভের পর আনন্দ। অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ।"[৭৪] এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাপারে বাংলার বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদ শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে

---

৭২ কথামৃত, ১।৬।৩।
৭৩ ঐ ১।৬।৩।
৭৪ ঐ ১।৬।৩।

হয় না। তিনি ব্রহ্মই সব হয়েছেন এই অভেদ উপলব্ধিতেই আনন্দ পেতেন।

ব্রহ্ম রসস্বরূপ পরম আস্বাদ্য ও আনন্দঘন, বাংলার বৈষ্ণবদের একথা শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করতেন। তিনি ব্রহ্মের রসাস্বাদনের আনন্দে বিভোর হ'তে চাইতেন এবং সেজন্য প্রায়ই রামপ্রসাদের কথায় গাইতেন—

'নির্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি'।

বাংলার বৈষ্ণবেরা বলেন, 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥'[৭৫] শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথার সমর্থন করেই যেন বলেছেন—"ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না। তারে বাড', তারে বাড়া আছে।"[৭৬]

জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাপারেও বাংলার বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয় না। তিনি "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব"[৭৭] বলে জীব ও শিবের অভেদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 'যত শিব তত শিব' শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বহু উদ্ধৃত উক্তি। জীব ও ব্রহ্মের এই অভেদ দৃষ্টির জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ 'জীবে দয়া' করার চেষ্টাকে অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলে মনে করতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ভক্তজনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আলোচনা করেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বৈষ্ণবধর্মের 'জীবে দয়া' কথাটি উচ্চারণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে যান। পরবর্তী ঘটনা স্বামী সারদানন্দের ভাষায় প্রকাশ করছি। "কতক্ষণ পর

---

৭৫ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ২।৮।৬৪।

৭৬ কথামৃত, ১।১২।২।

৭৭ ঐ ১।৮।৩।

অর্দ্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা, কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা'।" বক্তব্য সুস্পষ্ট। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা বলা দরকার। বাংলার বৈষ্ণবেরা জীবকে স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণ দাস বলে মনে করেন। বিভিন্ন দৃষ্টির সারবেত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের দৃষ্টিতে জীবের 'দাস আমি'র তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—"হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত এই অভিমান। এতে দোষ নাই। বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।"[১৮] একটি উপমা দিয়ে কথাটি বুঝিয়েছেন। তিনি বলছেন—"আমি দাস', 'আমি ভক্ত', এরূপ আমিতে দোষ নাই; মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়।"[১৯] বক্তব্যের নিহিতার্থ এই, মিছরি খেলে যেমন অম্বল হয় না তেমনি দাস আমিতে কোন ক্ষতি হয় না।

(৪)

'বাংলার বৈষ্ণব-সাধনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে আমরা এ-কথাই বলতে চাই—বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া যে নিমাই কায়া ধরেছিলেন এবং যিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে প্রেম বিলিয়ে গেছেন তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা পাপী-তাপী সকলের মুক্তিবার্তার বাহক শ্রীরামকৃষ্ণের মিলের অন্ত নেই। নিমাই-প্রচারিত বৈষ্ণব সাধনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত মাতৃসাধনায় মিলও আছে, অমিলও আছে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বৈষ্ণব সাধনার

---

১৮ কথামৃত, ১।৪।৭।

১৯ ঐ ১।৪।৬।

একজন রসগ্রাহী সাধক ছিলেন তেমনি তিনি তাঁর সমন্বিত দৃষ্টিতে অন্যান্য আরও সাধনার সার্থকতারও সাক্ষী দিয়েছেন। 'যার যা পেটে সয়' এই নীতি অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত সাধনারই অধিকারী ভেদে সার্থকতা স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সাগর-সঙ্গমে অন্যান্য সাধনার ধারার মতই বৈষ্ণব সাধনার ধারা এসে মিলিত হয়েছে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

॥ বিভিন্ন মরমিয়া সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বাউল-সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(১)

পণ্ডিতপ্রবর ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, "বাংলা দেশের সাধনার কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশের বাউলদের কথা বলিতেই হইবে। বাউল-সাধকেরা বাংলাদেশের মর্মের কথা বলিয়াছেন।"[১] এ-কথা আমরা সত্য বলেই মনে করি। সেজন্য বাংলার সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সঙ্গে বাংলার বাউল-সাধনার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি-আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। এ-কথা বিবেচনা করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

ভারতবর্ষ বহু ধর্ম-সাধনার পীঠস্থান। এ সমস্ত ধর্ম-সাধনার মধ্যে কতগুলো শাস্ত্রাশ্রিত এবং বিচার-বিশ্লেষণ-নির্ভর, আবার কতগুলো শাস্ত্র ও লোকাচারের বন্ধনমুক্ত এবং মানুষের সহজবোধ ও অনুভূতি-সিদ্ধ। প্রথম শ্রেণীর ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতের প্রসিদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়ের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনার ক্ষেত্রে অন্তরের অনুভূতি, সহজভাব এবং সমস্ত রকমের সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানুষের অমলিন উদার চিত্তের প্রাধান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যে সমস্ত সাধক শাস্ত্র ও লোকাচারের শাসন-মুক্ত হয়ে সহজ বুদ্ধি দ্বারা সাধনার পথে অগ্রসর হ'ন আমরা তাঁদের বলি সহজ সাধক। মধ্যযুগের সন্ত ও বাংলার বাউলমত এই সহজ সাধনার ধারা অনুসরণ করে চলেছে। সন্তমত ও বাউলমতের অধিকাংশ গুরুরাই হীন-

---

১ ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার বাউল, পৃষ্ঠা ১।

বংশজাত ও নিরক্ষর। কিন্তু এই ধর্ম-সাধনার ভাব-গভীরতা সত্যিই অতুলনীয়।

এই সাধনার আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, এর উদ্ভব অবৈদিক ভারতের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে। এই স্থানেই বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধমতের আবির্ভাব হয়েছিল। আচার্য ক্ষিতিমোহন বলেছেন—"হয়তো শৈব নাথ যোগ বৌদ্ধ সহজিয়া-মত ধর্ম-উপাসনা শক্তিপূজা প্রভৃতি অবৈদিক মতেরও মুখ্যস্থান ও আদি এই প্রদেশেই। বৈদিক ভূমির মধ্যে এই সব মতবাদীদের তেমন বসবাস ছিল না।"[২]

শাস্ত্র-শাসন-মুক্ত, দেশাচার-লোকাচার-বন্ধনহীন যে সাধনার ধারা ভারতবর্ষে লক্ষ্য করা যায় বাউল-সাধনা সে পথের পথিক। বাউল বলতে বাতুল বা পাগল বোঝায়। পাগলেরা যেমন সমাজের বাঁধন মানে না, বাউল সাধকেরা তেমনি সমাজ-সংসারের শাসন-মুক্ত। 'জ্যান্তে মরা' বাউল সাধনার একটি অঙ্গ। মরা মানুষের কাছে যেমন সমাজ-এর নিয়ম-অনুবর্তন আশা করা যায় না, তেমনি বাউলদের কাছে দেশাচার ও লোকাচারের আনুগত্য আশা করা বৃথা। সুফীদের মধ্যে 'দিরানা' (পাগল) নামে এক সম্প্রদায় ইসলাম শাস্ত্রের বন্ধন-মুক্তি ঘোষণা করেছেন। এঁদের মধ্যেও 'ফলা-ফিনা' বা জ্যান্তে মরা-র কথা আছে। আসল কথা, বাউল এবং সুফীদের মধ্যে দিরানা সম্প্রদায় নিজেদের পাগল বা মৃত বলে দেশ ও সমাজের সমস্ত বন্ধন অস্বীকার করেছেন।

বাউলেরা বলেন, "ঈশ্বরকে মন্দিরে, মসজিদে বা বহির্বিশ্বে কোথায়ও খোঁজার দরকার নেই, তিনি মনের মানুষ, মনেই থাকেন।"[৩]

---

২ ক্ষিতিমোহন সেন : বাংলার বাউল, পৃষ্ঠা, ১

৩ আমার মনের মানুষ যেরে
আমি কোথায় পাব তারে। (গগন বাউল)
কারে বোলবো কে করবে বা প্রত্যয়। আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

প্রেমের মধ্যে এই মনের মানুষ-এর যথার্থ পরিচয় মেলে। প্রেমে যদি তাঁকে পেতে হয় তবে অন্তর নিরন্তব কলুষমুক্ত রাখতে হবে। দেহালয়ই আসলে দেবালয়। মানব কায়ার সঙ্গে বিশ্বকায়ার যোগ সাধন করতে পারলেই যথার্থভাবে বিশ্বনাথের আসন পাতা যায়। বাউলদের ধারণা 'যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' তাই বিশ্বেশ্বরকে পেতে হলে নিজেকে বিশ্বের মত অসীম ও ব্যাপ্ত করা চাই। নইলে ব্রহ্ম সংকোচ-দোষ হয। তাই সাধনকালে ধ্যান অসীম শূন্যে ব্যাপ্ত করতে হবে। শূন্য সমাধির নামই খ-সম সমাধি। খ-সম-তত্ত্ব যখন 'খসম' অর্থাৎ প্রিয়তম হয়ে ওঠে তখনই তার যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটিত হয। একেই বলে সহজ সমাধি। প্রত্যেক বাউল এই সহজ সমাধি অভিলাষী। নিজ কায়ার মাধ্যমেই প্রেম-পথে এই অসীম-সাধনাব দিকে অগ্রসব হ'তে হবে। অতএব কায়াযোগই সারসাধনা। এই পথে অগ্রসর হতে হলে গুরুর সাহায্য নিতে হয়। গুরুর সাহায্যে এই অন্তর সাধনার পথে অগ্রসর হলে বাইরের বন্ধন আপনি দূর হয়, সাধক সর্ববন্ধন মুক্তিলাভ করেন। তখন পূজা-অর্চনার প্রয়োজন আর থাকে না, মূর্তি, তীর্থ, দেবালয়, শাস্ত্রবিধি সবই অবান্তর বলে বোধ হয়। বাউলেরা বলেন, বাইরের বেদকে বিদায় দিলেই অন্তরের বেদ ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। এই অন্তর-বেদেএর পরিচয় যে পেয়েছে বাইরের কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন তার থাকে না। পূজা-রোজা-নিয়ম-নেমাজ সব ঘুচে যায়। জাতি বর্ণ প্রভৃতির ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হয। এরই নাম কায়াগত সহজ বেদ। এই বেদই বিশ্বের আকাশে নানারূপে নিরন্তর প্রকটিত ও ধ্বনিত। বাউলদের ধারণা, এ-মত সহজ ও অনাদি মত। বেদেরও আগে এ-মত ছিল এবং বেদে এ-মতের প্রকাশ দেখা যায়।

ক্ষিতিমোহন সেন* যথার্থই বলেছেন—"বাউলেরা শাস্ত্রাচার ও লোকাচার মানেন না, মানেন শুধু রস ও ভাবের পথ। পাণ্ডেরা

সত্য খোঁজেন গ্রন্থের মধ্যে ; বাউলেরা খোঁজেন মানুষের মধ্যে। মানব-জমীন তাঁহারা পতিত রাখেন না।"[৪] বাউল-তত্ত্ব বা দর্শনের দিকটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর Philosophy of Our People এবং Hibbert Lecture-এ মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর Post Chaitanya Sahajia Cult গ্রন্থেও বাউল-তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। ক্ষিতিমোহন সেন 'বাংলার বাউল' এবং উপেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য বাউল গ্রন্থে বাউলদের সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট-ভাবেই একথা প্রকাশ করে বলেছেন—'এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।'

অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে[৫] বলেছেন —শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাউলদের আদিগুরু। ক্ষিতিমোহন সেন এ-কথা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, "মহাপ্রভুর বহুপূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউলদের নাম পাই।...ন্যাড়া সহজিয়া কর্তাভজা প্রভৃতি সবাই আপনাকে বাউল বলেন। আবার বাউলদের মধ্যেও বহু ভাগ-বিভাগ আছে। তাঁহাদের সবারই আদি বীরভদ্র বা চৈতন্য মহাপ্রভু বলা চলে না। নানা আকারে বাউল মতের অনুরূপ সাধনার ধারা এদেশে যে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্বেও দেখা গিয়াছে। মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীরা অনেক সময় বাউল বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই বুঝা যায়, বাউলদের তাঁহারাও জানিতেন।" ক্ষিতিমোহন আরও বলেছেন—"বাউলদের বাহিরেও বাউলিয়া মতের বহু লোক এবং সাধনা আছে। তাঁহাদের বাণীতে,

৪ বাংলার বাউল—৪৬ পৃষ্ঠা।

৫ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১৭১ পৃষ্ঠা।

গানে ও রচনায় তাহা দেখা যায়। আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক আছে। বাউল-ভাব হইল অন্তরের সত্য। বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় দেওয়া চলে না।"[৬]

বাউলদের মতে তাঁহাদের প্রেমতত্ত্ব যুক্তি-তর্ক বিচার বিশ্লেষণ করে বোঝার জিনিষ নয়, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার বস্তু। সেজন্য এক বাউল সাধক গেয়েছেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।

ফুলের বনে যদি সোনার জহরী ঢোকে তবে সে কমল নিকষে ঘসে বুঝতে চায়। কিন্তু, এ সত্যিই বড় অদ্ভুত ব্যাপার। এভাবে কমল বা কোন ফুল-এর মাধুর্য বোঝা যায় না। ফুলের মাধুরী বুঝতে অনুভূতি চাই। তেমনি প্রেমের কথা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়।

আসল বাউলেরা নিরক্ষর। তাঁরা পুঁথির ধার ধারেন না। মনের কথা গানের সুরে ছড়িয়ে যান। তাই এক বাউল গেয়েছেন—'আমরা পাখির জাত, ডাঙ্গায় চলার ভাও জানিনে উড়ে চলার ধাত।' পাখি যেমন অসীম গগন বিহারী, বাউলেরাও তেমনি খ-সম তত্ত্বের উপলব্ধির প্রয়াসী। ভাষার বন্ধনে অসীমের প্রকাশ চলে না, সুরের মুক্ত পাখায় ভর করেই তার আবির্ভাব হ'তে পারে। সেজন্যই বাউল সাধকেরা সুর দিয়ে সাধনা করেন। সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টি কোন বাউলের উদ্দেশ্য নয়।[৭] বাউল-সংগীত বাউল-সাধনার অঙ্গ। সেজন্যই

৬ বাংলার বাউল—৪৯-৫০ পৃষ্ঠা।

৭ বাউলেরা তাঁদের সংগীত গোপন করে রাখেন। এই গোপনতার কারণ কি, তা একদিন ক্ষিতিমোহন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে বাউল বলেছিলেন—'বাবা, ইহা ত সাহিত্য নয়। ইহা আমাদের অন্তরঙ্গ প্রাণবস্তু, আপন আত্মজা। যদি কেহ আমার কন্যাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে 'তাহাকে লইয়া আমি গৃহী হইব,' তবে সেক্ষেত্রে আমার দেওয়াই উচিত। সেই দেওয়াতে আমি ধন্য, আমার আত্মজাও ধন্য।

বাউলেরা সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চান না। সাধনার কথা সকলকে কি বলা যায়?

বাউলদের মতে—জীব ব্রহ্মস্বরূপ, মনের মানুষ মনেই থাকে। অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে এ-কথার মিল আছে। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্মকে জানার একমাত্র উপায় জ্ঞান এবং জ্ঞানেই মুক্তি। বাউলেরা এ-কথা মানেন না। তাঁরা বলেন, মনের মানুষ প্রেমে ধরা দেন। সেজন্যই তাঁরা গেয়েছেন—'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়, ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তারি পায়।' মনের মানুষকে মনোবেড়ি দিতে না পারলে ধরা দেবে কেন?

বাউলেরা স্বর্গের সুখ চান না। স্বর্গ-প্রাপ্তি তাঁদের আদর্শ নয়। তাঁরা চান মুক্তির নিবিড়ানন্দ। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন বলেন, (বাউলদের মতে) 'মুক্তি হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ। এই মুক্তি লাভ করিলে ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য সাধক আপনিই পায়, যদিও কিছু পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বাউলেরা মানুষই জানেন। তাঁদের মতে স্বর্গের অমৃতের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর। তাই প্রেমামৃত প্রার্থী দেবতারাও পৃথিবীতে জন্মিয়া মানুষ হইতে চাহেন—

প্রেম আমার পরশমণি তারে ছুঁইলে যে কাম হয়রে সেবা।

তাই গোলক চায় যে ভূলোক হতে মানুষ হৈতে চায় যে দেবা।'[৮]

বাউলদের মতে—প্রেম এমনি পরশমণি যে তার স্পর্শ পেলে কামও সেবা রূপ ধারণ করে, গোলক প্রেমের জন্যই ভূলোক-ভিখারী, দেবতা মানুষ হবার প্রয়াসী। বাউলেরা যে প্রেমের অধিকার চান, সে

কিন্তু কোন লোক শুধু রসাস্বাদন সুখের জন্য যদি আমার আত্মজাকে চাখিয়া দেখিতে চাহেন তবে প্রার্থীও অধন্য, আমিও অধন্য, আত্মজাও অধন্য। এই সব বাণী সাহিত্যরসের আস্বাদনের জন্য নয়, ইহা সাধনার জন্য।—বাংলার বাউল, ৭০-৭১ পৃষ্ঠা।

৮ ক্ষিতি মোহন সেন : বাংলার বাউল, ৫১ পৃষ্ঠা।

প্রেম নরনারীর অন্তরের কাম-কলুষিত কোন প্রবৃত্তি নয়, নরনারীর অন্তরের গভীর ও নিবিড় মুক্তি। এই মুক্তির পথে কোন শাস্ত্র বা আচার সহায়ক হ'তে পারে না। সেজন্যই বাউল সাধনায় শাস্ত্র ও আচারের কোন স্থান নেই। 'শাস্ত্রের চেয়ে বাউলের নিঃশব্দ মরম-কথা মহত্তর'।

মনের মানুষের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে প্রেম তা'ত একদিনের নয়, তা চিরন্তন প্রেম। এই প্রেম পুষ্পের মত ধীরে ধীরে নিরন্তর প্রস্ফুটিত হয়ে চলেছে। তাই বাউল গেয়েছেন—

হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটে
কত যুগ ধরি।
তাতে আমিও বাঁধা তুমিও বাঁধা
উপায় কি করি!

এই প্রেম যখন জাগে তখন কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তখন হিন্দু-মুসলমান কারও কোন বাধা থাকে না। সেজন্যই বাউলেরা হিন্দু মুসলমান সবাইকেই গ্রহণ করেন। সেজন্যই বাউলদের মধ্যে হিন্দুর শিষ্য মুসলমান এবং মুসলমানের শিষ্য হিন্দু প্রচুর দেখা যায়। বাউলদের পোশাকে মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রেমের এমনই মহিমা যে তাতে দুই এক হয়। প্রেমিক প্রেমিকার প্রাথমিক ভেদ তাদের আন্তরিক নিবিড়তার অভেদে রূপান্তরিত হয়। 'জ্ঞানে কখনই দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধ ঘোচে না। ঘোচে প্রেমে'। বাউলেরা তাই বলেন—

নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।

পরকে আপন করতে পারার মধ্যেই প্রেমের মহত্ত্ব। যে প্রেম নিজেকে নিয়ে বিব্রত তা ব্যর্থ, পরকে আপন করেই প্রেমের সার্থকতা। সেজন্যই বাউলেরা 'পরকীয়া'-প্রয়াসী। ক্ষিতিমোহন এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'স্বকীয়ার উপর ত অধিকার আছেই। প্রেমের সেখানে

আর কি রহিল করিবার? সমাজবিধান অনুসারেই সে আমার অধিকৃতা (অর্থাৎ possession)। আমার কাছে ধরা দিতে সে বাধ্য। ঘরের পাখী শিকার করিয়া যেমন (sport) শিকার হয় না, তেমনি বাধ্য অধিকৃতকে লাভ করিয়া প্রেমের প্রেমত্ব প্রকাশ হয় না।'[৯]

চৈতন্য চরিতামৃতেও পরকীয়া প্রেমেরই পরম মাধুর্য স্বীকৃত হয়েছে। পরকীয়া প্রেমই বৈষ্ণবদের প্রার্থনীয়। চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে[১০]—

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস॥

প্রেমে নরনারী সমপর্যায়ভুক্ত হয়। সাধনার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরকে বড মনে করে এবং নিজেকে দীন মনে করে প্রেম-সাধনা হয় না।

আমার ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বদ্ধ আমি না হই অধীন॥[১১]

যেথানে ঈশ্বরকে ভক্তের সমপর্যায়ভুক্ত বা ভক্তকে ঈশ্বরের চেয়ে বড মনে করা হয় সেখানেই প্রেমের সার্থকতা—

আপনাকে বড় মানে, আমাকে সমহীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥[১২]

অনিশ্চয়তা না থাকলে প্রেমের মাধুর্যই থাকে না। পাব-কি-না-পাব এই হৃদয়-দোলা না থাকলে আর পেয়ে আনন্দ কিসের? সেজন্যই ধর্ম ও সমাজবিধি সমর্থিত প্রেমে প্রেমের সার্থকতা নেই। তাই বাউলেরা সাধারণতঃ ফকীর। তবে তাঁদের মধ্যে গৃহস্থও আছেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে—গৃহস্থ পরকীয়া প্রেমের অধিকারী হবে

৯ ক্ষিতি মোহন সেন: বাংলার বাউল, ৫৩ পৃষ্ঠা।
১০ চৈতন্য চরিতামৃত (আস্ত, চতুর্থ)।
১১ ঐ
১২ ঐ

কি ক'রে? বাউল বলেন, ঈশ্বরের কৃপায় তা হ'তে পারে; আবার কারও হয়ই না। তখন জীবন বৃথা গেল বলে মনে করতে হবে।

বাউলেরা প্রকৃতিভাবে বা সখীভাবে আরাধনা করেন। প্রকৃতি-ভাব বলতে কি বোঝায়? পুরুষ হিসেব করে চলে। ক্রমে ক্রমে সে অগ্রসর হয়। বিবাহের পর পুরুষ ক্রমে স্ত্রীকে চেনে। পুরুষ সন্তানকেও ক্রমেই চেনে। পুরুষের এই ভাবকে বলা যেতে পারে পুরুষভাব। পুরুষভাব আসলে জ্ঞান ও কর্ম পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু, প্রকৃতি বা নারী ক্রমে অগ্রসর হয়না। তাঁর পক্ষে সব কাজই তৎক্ষণাৎ করতে হয়। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীকে আত্মসমর্পণ করতে হয় স্বামীর কাছে এবং স্বামীর সংসারের কাছে। মা সন্তানের সূচনা থেকেই সন্তানকে স্বীকার করতে বাধ্য হন। পুরুষের মত সবুর করা তাঁর চলে না। এই বে-সবুরী ভাবই নারী বা প্রকৃতি ভাব। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ এই ভাবের মূল কথা। এ জিনিস জ্ঞানে বা কর্মে সম্ভব নয়, সম্ভবএকমাত্র প্রেমে। নারীর ধর্ম এই প্রেম। সেজন্যই বাউলেরা নারীভাবে বা প্রেমপথে সাধনা করেন। বৈষ্ণবেরাও এই পথের পথিক। চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে সাধনা করেছিলেন। সুফী সাধনায় প্রেম-পথের সৌন্দর্য স্বীকৃত, কিন্তু প্রকৃতি-ভাবে আরাধনা সুফী সাধনার অঙ্গ নয়। সুফী সাধনায় ভগবানকে নারী এবং ভক্তকে পুরুষ বলে কল্পনা করা হয়।

বাউলেরা সহজ সাধনা করেন। প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে নীরব। ঝড়ে যখন প্রকৃতি মুখর হয় তখন তাতে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। সহজ শান্তিই শাশ্বত। অশান্তি অস্থায়ী। কাম ক্ষণিক, নিষ্কাম প্রেমই সহজ, শান্ত ও চিরন্তন। এই প্রেম-সাধনা সহজ সাধনা এবং তা নীরবে মনে মনে চলে। ঈশান বাউল গেয়েছেন—

আমার সাঁই নয় তো ভাঙ্গা চাকা যে বলবে ক্ষণে ক্ষণে

* * * *

বল নীরব গুরু সাঁই, কোন্ সাধনে বাহির হলে ব্রহ্ম-কমল পাই
(চলে) চন্দ্রতারা নিত্য ধারা, কোনো শব্দ নাই ;
চক্রে চক্রে চলছে যে সাধন,
তার নাই কোনো রব সদাই নীরব, ভরছে যে রস
(চলছে যে যোগ)—মনে মনে ॥[১৩]

চন্দ্রতারা যেমন নীরবে সাধনা করে চলেছে, তেমনি মনে মনে নীরব সাধনার সহজরসে রসরাজকে ধরতে হবে। এই সহজরস নিত্য প্রবাহিত এবং স্বরূপতঃ অমৃতরস।

(২)

আমরা বাউল-সাধনার মূলকথা প্রকাশ করেছি। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এই কথা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং মধ্যযুগীয় সন্তদের মধ্যেও পাওয়া যায়।

ঋগ্‌বেদের (১০.৯০) পুরুষ সূক্ত-এ বাউল সাধনার মূল তত্ত্ব মেলে। পুরুষ সূক্তে এই বিশ্বভুবন বিধৃত এবং বিশ্বভুবন অতিক্রমী এক বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে।[১৪] বলা হয়েছে, এ বিশ্বে যাহা ভূত বা ভবিষ্যৎ সবই এই পুরুষ—

পুরুষং এবেদং সর্বং
যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥ ঋগ্‌বেদ ১০.৯০.২

কোন কোন উপনিষদেও এই পুরুষেরই জয়গান করা হয়েছে। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ।[১৫] ঈশোপনিষদে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' (ঈশ ৪০।১) বলে এই

---

১৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গবাণী, ২৩ পৃষ্ঠা।

১৪ সভূমিং বিশ্বতো বৃত্ব
অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥ ঋ ১০.৯০.১

১৫ কঠ ৩।১১

পুরুষেরই কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদে 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মান্যেবানুপশ্যতি, সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপসতে' (ঈশ ৬) অর্থাৎ আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখার কথা বলা হয়েছে। একথাই বাউলেরাও বলেছেন। বাউলদের মতে—'মনের মানুষ'ই সমস্ত সাধনার ধন, এই মানুষই সমস্ত বিশ্বের মূল। বাউল হাসন রজা গেয়েছেন—

মম আঁখি হৈতে পয়দা আসমান জমীন।
কর্ণ হৈতে পৈদা হৈছে মুসলমানী দিন॥
আর পয়দা করিল যে শুনিবারে যত।
শব্দ সাজ আরাজ ইত্যাদি যে কত॥
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম॥
নাকে করিয়াছে খুসবয় আর বদবয়।
আমি হৈতে সব উৎপত্তি হাছন রজা কয়॥

ঋগ্‌বেদেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে, পুরুষের মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু, নাভী থেকে অন্তরীক্ষ, মাথা থেকে দ্যুলোক, পথ হ'তে ভূমি, শ্রোত্র বা কর্ণ থেকে সর্বদেব ও সর্বলোক-এর উৎপত্তি।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুর জায়ত॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দৌঃ সমবর্ততে।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকান্ অকল্পয়ন।

ঋ. ১০.৯০.১৩-১৪

মহাভারতে ভীষ্মও বলেছেন—ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নাই। এই মানুষই বাউলদের উপাস্য।

উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' তত্ত্ব বাউলেরাও বিশ্বাস করেন। তাঁরা

বলেন—'জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার, ওরে তুই নূতন লীলা কি দেখবি যার নিত্য লীলা চমৎকার।'

ক্ষিতিমোহনের মতে—অথর্ববেদেই বাউল সাধনার সমর্থন সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। বাউলেরা স্বর্গ থেকে পৃথিবীকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। তাঁরা স্বর্গ-সুখ কামনা করেন না, পেতে চান বিশ্ব-প্রেমের মাধ্যমে মুক্তির পরমানন্দ। অথর্ববেদ বলেছেন—

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ॥ অথর্ব ১০.১.১.

এই পৃথিবী স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বর্গ বিধৃত রয়েছে সূর্যের দ্বারা আর পৃথিবী বিধৃত রয়েছে সত্যের দ্বারা। ক্ষিতিমোহন বলেন, 'অন্য সব বেদ স্তব করেন দেবতাদের, অথর্ব স্তব করেন মানবের (১০.২.১১.৮ ইত্যাদি)। স্বর্গের বদলে অথর্ব স্তব করিলেন মহীর অর্থাৎ পৃথিবীর (১২.১)। তাই জোরের সহিত আথর্বণ ঋষি বলিলেন, পৃথিবী আমার মাতা, আমি তাঁহার পুত্র—মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥ অথর্ব ১২.১.১২।'[১৬] বাউলেরাও অথর্ববেদের মতই মানবের এবং পৃথিবীর জয়গান করেছেন।

বাউলেরা যেমন প্রেমের ভিখারী, মৈত্রীর প্রয়াসী, অথর্ব বেদও তাই। অথর্ব বেদ বলেছেন—'সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ'।[১৭] পরস্পরের সহৃদয়তা, অবিদ্বেষ এবং মৈত্রী চেয়েছেন অথর্ব বেদ। বাউলেরা যেমন ধ্যান অসীম শূন্যে ব্যাপ্ত করার কথা বলেন অথর্ববেদও তেমনি বিশ্বপুরুষের সঙ্গে আমাদের মত মানুষের সংযোগ যে ধ্যানে একথা স্বীকার করেন। অথর্ববেদ বলেছেন—বিশ্বেপেসং থিয়ম।[১৮] বাউলদের মত অথর্ববেদও বলেন, মানুষের মধ্যে যিনি

---

১৬ .বাংলার বাউল, ১৫ পৃষ্ঠা।

১৭ অথর্ব বেদ ৩।৩০।১

১৮ ঐ ২০।৩৫।১৬

ব্রহ্মকে দেখেন তিনিই যথার্থভাবে তাঁকে দেখেন—'যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্' ।[১৯]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' বলে নিত্যচলার যে জয়গান করা হয়েছে বাউলদের মধ্যেও সাধনার পথে নিত্য অগ্রগতির স্বীকৃতিতে সে কথাই ঘোষিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাধক কবীর একথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—

বহতা পানী নির্মলা বন্ধা গন্ধিলা হোয়।

যে জল বয়ে যায় সে জল নির্মল আর বন্ধ জল হয় গন্ধযুক্ত। সেজন্যই কবীর পন্থীদের নির্দেশ—মনে অবসাদ এনো না, যতক্ষণ জেগে থাকো ততক্ষণ নিজেকে যাত্রী মনে করবে—'করনা নহী মন দিলগিরী। জব জাগো তব মুসাফিরী' ॥

বাউলেরা যে প্রেমের জয়গান করেছেন তাও উপনিষদে পাওয়া যায়। 'জীব ও ব্রহ্ম দুইই পরম বন্ধু, প্রেমে মাখামাখি'—বলছেন মুণ্ডক উপনিষদ।[২০] মুণ্ডক আরও বলেছেন—মেধা, শ্রুতি, প্রবচন কোন কিছু দিয়েই তাঁকে পাওয়া যাবে না, তিনি যদি আপন প্রেমে ধরা দেন তবেই তাঁকে মিলবে—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' (মুণ্ডক ৩।২।৩)।

প্রখ্যাত উপনিষদ ছাড়াও ছোট ছোট কতগুলো উপনিষদ আছে। অনেকেই তাদের পরিচয় রাখেন না। **F. Otto Srhader 'Minor Upanisads'** নাম দিয়ে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এরকম কতগুলো উপনিষদ প্রকাশ করেছিলেন। এ সমস্ত উপনিষদের সঙ্গে বাউল মতের সাদৃশ্য খুব বেশী। শাট্যায়ণীয়োপনিষদ বলেন, মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ—'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ' (৩২১

---

১৯ অথর্ব বেদ ১০।৭।১৭

২০ দ্বা সযুজা সখায়া। মুণ্ডক ৩।১০

পৃষ্ঠা)। বাউলদেরও এই একই কথা। তাঁরা বলেন, বাহ্যবিচারে কিছু লাভ নেই, মন-শুদ্ধিই আগে দরকার। বাউলদের মতই মৈত্রেয় উপনিষদ বলেছেন—'বর্ণাশ্রম ধর্ম ছেড়ে আন্তর সাধনাতেই পুরুষ সানন্দতৃপ্তি লাভ করে—'বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্যজন্তঃ। সানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি।' এই উপনিষদ আরও বলেন, বাহ্যার্চন পরিহার ও স্বহৃদয়ার্চন বা আন্তর সাধনা গ্রহণ মুক্তির জন্য অপরিহার্য ; পাষাণ, লৌহ বা মৃন্ময় বিগ্রহ পূজায় মুক্তি নেই—

পাষাণ লোহমণি মৃন্ময় বিগ্রহেষু
পূজা পুনর্জনন ভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
তস্মাদ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনমেব কুর্যাদ
বাহ্যার্চনং পরিহরেদ পুনর্ভবায় ॥

একথা ত একান্তভাবে বাউলদেরই কথা। বাউলদের মতই এসব উপনিষদবাদীরা সন্ধ্যা পূজা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, অশৌচকালে ত সন্ধ্যা পূজা থাকতে পারে না ; আমাদের মোহ মাতা মরেছেন আর বোধময় সন্তান জন্মেছে, তাই সন্ধ্যা উপাসনা করা চলবে না—

মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
সূতকদ্বয় সংপ্রাপ্তে কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥[২১]

দেহই দেবালয় এবং তাহাতে অবস্থিত জীবই শিব, বাউলদের এই কথা মৈত্রেয় উপনিষদেও পাওয়া যায়—

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ ॥

বাউলেরা যে 'হৃদয়-কমল'-এর কথা বলেছেন, অথর্ববেদ যে দেহ-কমল-এর কথা বলেছেন তার সঙ্গে তন্ত্রের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন—'তন্ত্রে সাধারণত ষট্‌চক্রেরই কথা। ছয়চক্র হইতে বেশিও সাধনা-শাস্ত্রে আছে। ইড়া-পিঙ্গলাকে

২১ মৈত্রেয় উপনিষদ ১১৬ পৃষ্ঠা

চন্দ্র-সূর্য-গঙ্গা-যমুনা বলা হয়। সুষুম্নার মধ্য দিয়া তাহাদের যুক্ত স্রোত উর্ধ্বগামী করিয়া যে সাধনা তাহাতে বাউল ও তন্ত্রমতে কিছু ভেদ আছে। তবু মিল যাহা তাহা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তান্ত্রিকেরা যদিও তাঁহাদের তন্ত্রকে বেদের পরবর্তী বলিয়া মানিতে চাহেন না, তবে তাহা ত সাধাবণ পণ্ডিত জনেরা স্বীকার করিবেন না। যাহা হউক, আমি সময়ের কোন দাবি না রাখিয়াই প্রসঙ্গবশে এইখানে তন্ত্রের কায়া সাধনের কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রের ষটচক্র হইল মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। ষটচক্র বিষয়ে চমৎকার গ্রন্থ পূর্ণানন্দের ষটচক্র-নিরূপণ। কালীচরণকৃতা অমলা টীকাও তাহার আছে।...মহানির্বাণ, কুলার্ণব, রুদ্রযামল, প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্র পড়িলে বাউল মতের সঙ্গে কায়াযোগগত বহু কথাই সকলে পাইবেন। মিল অমিল দুইই আছে। তান্ত্রিকদের সঙ্গে বাউলদের কায়াবোধ এবং কায়াযোগেরই মিল দেখা যায়। অনুরাগতত্ত্ব কিন্তু বাউলদের বিশেষত্ব। তাহার কিছুই তন্ত্রে মেলে না। বেদাচার এবং লোকাচারের বিরুদ্ধে বাউল ও তন্ত্রসমাজ বিদ্রোহী।[২২] আমরা সেন মহাশয়ের একথা সমর্থন করি।

জৈন দোহা এবং বৌদ্ধ দোহায় বাউল সাধনার সদৃশ ধারণা পাওয়া যায়। জৈন পাহুড় দোহায় বাউলদের জীব শিব তত্ত্ব, মোক্ষ-লাভে শাস্ত্রপাঠের অনাবশ্যকতাও চিত্তশুদ্ধির অপরিহার্যতা, দেহলায়ই দেবালয়তত্ত্ব প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' গ্রন্থটির ৩১-৩২ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন।

বৌদ্ধদের দোহাতেও বাউলতত্ত্ব পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্র বাগচী বৌদ্ধদের যে দোহাকোষ সম্পাদনা করেছেন তাতে সহজ দিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। সহজের পরই সমরস (১।২), তারপর

২২ বাংলাব বাউল, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা

'খসম'-এর কথা (১।৫), 'গুরু-কৃপায় এই তত্ত্বলাভের উপায় প্রভৃতি অনেক বাউল-প্রত্যয় পাওয়া যায়।

জাতি পংতি অস্বীকার করে যে বাউল মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে কতগুলো পুরাণেও মিল লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্য পুরাণ (৪১। ২৯, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৫৫) বিশেষভাবে জাতি-পংতির ভেদ অস্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে আরও অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে সে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না। সেজন্য আমরা এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

(৩)

আমরা বাউল-সাধনার সার কথা আলোচনা করে এ বাণী যে বিভিন্ন বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, জৈন ও বৌদ্ধ দোহা, মহাভারত এবং পুরাণেও পাওয়া যায় তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। এবার বাউলদের বাণী মধ্য-যুগীয় সন্তদের ধারণার মধ্যে কিভাবে মর্মরিত হয়েছে তা দেখাতে চেষ্টা করবো।

আমরা জানি, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়েছে। মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন তাঁদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং ধর্মবোধও সঙ্গে নিয়ে এলেন। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে এই নবাগত সংস্কৃতির পার্থক্য এমনই সুস্পষ্ট যে পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেও এই দুই সংস্কৃতির কোন তাত্ত্বিক মিলন ঘটাতে পারলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দল মরমীয়া (mystic) সাধনার পথে এই দুই ধারাকে মিলিয়ে দিলেন। এঁদের কথা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতে মধ্য-যুগের সাধনার ধারা' (অধর মুখার্জি বক্তৃতা) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে বাউল মরমীয়া সাধনার সঙ্গে এই সাধকদের মর্মবাণীর সাদৃশ্য সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এই সাধকদের মধ্যে কবীরের গুরু রামানন্দ-এর কথায় বাউল-সাধনার সার মর্ম পাওয়া যায়। রামানন্দ জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে রামানুজের দলে ছিলেন। কিন্তু অন্তরে যখন তাঁর প্রেমের বাণ ডাকলো তখন আচার-বিচারের সমস্ত বেড়াজাল ভেসে গেল। সম্প্রদায় তাঁকে ত্যাগ করলো। তিনি সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে দীক্ষা দিলেন জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, নাপিত সেনা, জাঠধন্না এবং অনেক নারীকে। তিনি প্রচার করলেন—বাহ্য আচারই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাধা, প্রেমে-ভক্তিতে তাদের মিলতে হবে। তিনি আরও বললেন—ধর্ম ত বাইরের জিনিস নয়, এ ত অন্তরের ধন। মানবদেহের মধ্যেই মানুষের নিত্যপ্রিয় বিরাজ করেন। এই নিত্যপ্রিয়কে পেতে হলে কায়াযোগে যুক্ত হ'তে হবে। বাইরে প্রিয়কে খোঁজার দরকার নেই, ঘবেই্‌ তাঁর অরূপ লীলা—

কত জাই ঐরে ঘর লাগু রংগু ॥ (গ্রন্থসাহেব বসন্তরাগ)

একথা বাউলদেরই কথা। বাউলদের এই প্রাণের কথা আরও বিস্তারিত করে রামানন্দ বলেছেন—

> এক দিবস মন ভঈ উমংগ।
> ঘসি চংদন চোআ বহু সুগংধ ॥
> পূজন চালী ব্রহম ঠাঁই।
> সো ব্রহমু্‌ বতাই ও গুর মনহী মাহি ॥
> জহাঁ জাই ঐ তহঁ জল পখানা ॥ (পূর্ববৎ)

পূজো করতে ব্যাকুল হ'য়ে একদিন চুয়া-চন্দন নিয়ে গিয়েছিলেম বাইরের দেবালয়ে। গুরু বললেন, ব্রহ্ম যে তোর মনেই আছে; বাইরে যেখানে যাবি সেখানে তীর্থের নামে জল আর মূর্তির নামে শুধু পাষাণ মিলবে।

রামানন্দ আরও বলেন, বেদ-পুরাণে তাঁকে বৃথা খোঁজা, অন্তরের ধন অন্তরেই মিলবে।

বেদ পুরাণ সভ দেখে জোই।
উহাঁ তউ জাই ঐ জউ ঈহাঁ ন হোই॥

(গ্রন্থসাহেব বসন্তরাগ)

পরবর্তীকালে রামানন্দ-শিষ্য কবীরও বাউল তত্বই প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন—খোদা মসজিদে নেই, রাম নেই তীর্থে, মূর্তিতে। ভগবান আছেন সমস্ত মানুষেরই অন্তরে। সেখানেই তাঁকে খুঁজতে হবে।

জৌর খুদাই মসৃজিদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কিসকেরা।
তীরথ মুরত রাম নিবাসী দুহুমে কিনলু ন হেরা॥
পূরব দিসা হরীকা বাসা পছিক অলহ মুকামা।
দিলহী খোজি দিলৈ দিল ভিতরি ইহাঁ রাম রহিমানা॥

'জ্যান্তেমরা' বাউল-সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। দেহের মধ্যে যে মনের মানুষ আছে তার সঙ্গে প্রেমে লীন হ'তে হবে তবেই তো মুক্তি। এই প্রেমে লীন হওয়ার নামই মরা। এই মৃত্যু জীবন থাকতেই সম্ভব। সেজন্যই এর নাম 'জ্যান্তেমরা'। আসল কথা, প্রিয়তমের মধ্যে প্রেমের সাধককে মরতে হয় তবেই আসে প্রেম-সাধনার সার্থকতা। কবীরও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন—'জীবত মেঁ মরণা ভলা জো মরি জানৈ কোয়।'[২৩] যে মরতে জানে তার জ্যান্ত মরাই উচিত।

কবীর আরও বলেন, মরবে ত সবাই। তবে কায়ার মধ্যে যে সমুদ্র আছে তার মধ্যে ডুবলে রত্ন মিলবে। জ্যান্ত মরলে মিলবে ভগবান।

মরতে মরতে জগ মুআ ঔসর মুআ ন কোয়[২৪]

এবং

---

২৩ সাখীগ্রন্থ, ৩৩০ পৃষ্ঠা

২৪ ঐ

কায়া মাহি সমুদ্র হৈ অংত না পারৈ কোয়।
মিরতব হোয় করি জো রহৈ মাণিক পারৈ সোই ॥[২৫]

বাউলেরাও বলেন—

আছে তোরই ভিতর অতল সাগর তার পাইলি না মরম।

বাউলদের 'জ্যান্তমরা' তত্ত্ব সুফী মরমিয়াবাদীরাও স্বীকার করেন। তাঁদের 'ফনাফিলা' তত্ত্ব আর বাউলদের 'জ্যান্তমরা' তত্ত্ব আসলে একই জিনিস। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সুফীরা 'আনল হক্' বলে পরমাত্মা যে জীবাত্মার মধ্যেই আছে বাউলদের একথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। সুফীরাও বাউলদের মতই প্রেম-তন্ময়তায় বিশ্বাসী। তবে এই ব্যাপারে বাউলদের সঙ্গে সুফীদের কিছু তফাত আছে। আমরা একথা আগেই আলোচনা করেছি।

খ্রীষ্টান মরমীয়াবাদীরাও (Christian mystics) বাউলদের মত জীবাত্মাই পরমাত্মা, একথা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন—'Thou and thy heavenly father are one.'-আরও কথা, বাউলদের জ্যান্তমরা' তত্ত্বও খ্রীষ্টান মরমীয়াবাদীরা স্বীকার করেন। তাঁরা Crucifixion of the flesh for the resurrection of the Spirit বলে আত্ম-প্রাপ্তিরজন্য দেহ-নাশ-এর যে তত্ত্ব প্রচার করেছেন তার সঙ্গে 'জ্যান্তমরা' তত্ত্বের মিল অনস্বীকার্য।

বাউলেরা বলেন, প্রেম ছাড়া জ্যান্তমবা সম্ভব নয়। সুফী এবং খ্রীষ্টান মরমীয়ারাও একথার প্রতিধ্বনি করেন। একজন যদি আর একজনের মধ্যে আত্মবিলয় ঘটাতে না পারে তবে প্রেম সার্থক হয় না। একথা কবীরও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, যখুন প্রিয়তম থাকেন, তখন আমি থাকি না; এখন আমি আছি তিনি নেই। প্রেমের পথ বড় সুক্ষ্ম। দু'য়ের এখানে ঠাঁই নেই।

২৫ সাখীগ্রন্থ ৩৩১ পৃষ্ঠা

জব মৈঁ থা তব পিব নহী অব পিব হৈ মৈঁ নাহিঁ।
প্রেম গলী অতি সাঁকরী তামেঁ দো ন সমাহিঁ॥[২৬]

বাউলেরা যেমন দ্বৈত এবং অদ্বৈত-এর দ্বন্দ্ব প্রেমের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন (নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম) কবীরও তেমনি প্রেমের মধ্যে দুই-এর মিলন সম্ভব বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রেমগলী অতি সাঁকরী, তামেঁ দো ন সমাহিঁ॥

বাউলেরা যেমন মালা জপ এবং নাম কীর্তন-এর চেয়ে সহজ সাধনার বেশী পক্ষপাতী কবীরও তাই। তিনি বলেছেন—

মালা জপূঁ না কর জপূঁ মুখসে কঁহু ন নাম।

বাউলদের সহজ সাধনা যেমন নিরন্তর চলে কবীরের সহজ জপও অনবরত চলছে। কবীর বাউলদের মতই সহজ সমাধির সাধক। তিনি বলেন—

সাধো সহজ সমাধি ভলী—
গুরু প্রতাপ জা দিনতৈ উপজী দিন দিন অধিক চলী।
জহঁ জহঁ ডোলোঁ সোই পরিকরমা যো কুছ করোঁ সো সেবা।
জব সোবোঁ তব করোঁ দণ্ডবত পূজোঁ ঔর ন দেবা।
কহোঁ সো নাম সুনোঁ সো সুমিরণ খাবঁ পিয়োঁ সো পূজা।
গিরহ উজাড় এক সম দেখূ ভাব ন রাখূঁ দূজা॥
আঁখ ন মুদোঁ কান ন রূঁধো কায়া কষ্ট নহি ধারোঁ।
খুলে নৈন পহিচানো হাঁসি হাঁসি সুন্দর রূপ নিহারোঁ॥

হে সাধু, সহজ সমাধিই ভালো। গুরুর কৃপায় যেদিন এধন পেয়েছি সেদিন থেকে ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। যেখানে যেখানে যাই সেখানে সেখানেই পরিক্রমা যা কিছু করি সবই তাঁর সেবা। যখনই শয্যা নিই তখনই দণ্ডবৎ করি। আর কিছু পুজো আমার নেই। যা কিছু বলি সবই তাঁর নাম, যা কিছু শুনি সবই তাঁর স্মরণ, যা কিছু

২৬ সাখীগ্রন্থ, ১৫৫ পৃষ্ঠা

খাই ও পান করি সবই তাঁর পুজো। ঘর-বাহির আমার কাছে এক। আমার কোন দ্বৈত ভাব নেই। এখন আমি চক্ষু বন্ধ করিনে, কান বন্ধ করিনে, কায়াকষ্ট করিনে, নয়ন খুলে হেসে হেসে আমি সর্বত্র তাঁর সুন্দর রূপ দেখি।

বাউলদের কায়াযোগ কবীর ও দাদূ দুজনেই স্বীকার করেন। দাদূর কায়াবেলী থেকে এ মতের সমর্থনে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। দাদূ বলেছেন—

কায়া মাঁহে সিরজনহার।
কায়া মাঁহে ওঁকার॥
কায়া মাঁহে হৈ আকাশ।
কায়া মাঁহে ধরতি পাস॥

* * * *

কায়া মাঁহে জ্যোতি অনংত।
কায়া মাঁহে সদা বসংত॥
কায়া মাঁহে মংগলাচার।
কায়া মাঁহে জয়জয়কার॥
কায়া মাহি কর্তার হৈ সো নিধি জানৈ নাঁহি।
দাদূ গুরু মুখি পাইয়ে সব কছু কায়া মাহি॥

ক্ষিতিমোহন সেন এ বাণীর যে অনুবাদ দিয়েছেন তা তুলে দিচ্ছি।

কায়ার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা।
কায়ার মধ্যেই ওঁকার॥
কায়ার মধ্যেই আকাশ।
কায়ার মধ্যেই ধরণী-পরশ॥

* * * *

কায়ার মধ্যেই জ্যোতি অনন্ত।
কায়ার মধ্যেই সদা বসন্ত॥

কায়ার মধ্যেই মঙ্গলাচার।
কায়ার মধ্যেই জয়জয়কার॥

কায়ার মধ্যেই রয়েছেন কর্তা। দেহালয়ই দেবালয়। বাইরের বিশ্বে তাঁকে খুঁজতে গিয়েই যত বিড়ম্বনা। বাউলেরা যেমন নিত্যজপের কথা বলেন এবং সমস্ত জীবনটিকে একটি পূজা রূপে নিবেদন করার নির্দেশ দেন, দাদূও তাই বলেছেন—

নখসিখ সব সুমিরণ করে ঐসা করিয়ে জাপ।
অংতরি বিগসে আত্‌মা তব দাদূ প্রগটে আপ॥

এমন জপ কর যেন নখ থেকে মাথার শিখা পর্যন্ত সবই জপে নিরত থাকে। এমন করতে পারলেই অন্তরাত্মা বিকশিত হবে, তিনি প্রকট হবেন জীবাত্মায়।

(৪)

বাংলা দেশে বাউল সম্প্রদায় ছাড়াও কর্তাভজা বা আউল নামে একটি সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয় কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,[২৭] ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মতের আদিগুরু আউল চাঁদ। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন বলেন[২৮]—'আউল চাঁদের মতকে রামশরণই ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে আউল চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ২২জন শিষ্য, সবই নিম্নজাতীয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন রামশরণ। পরে অনেক ভদ্রলোকও রামশরণের শিষ্য হইলেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়কে কর্তাভজা বলে। ইহারা জাতি-পংক্তি-সম্প্রদায়গত ভেদ মানেন না। ইঁহারা মনে করেন,

---

২৭ অক্ষয় কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১৮৬ পৃষ্ঠা

২৮ বাংলার বাউল, ৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা

আউল চাঁদ, চৈতন্য মহাপ্রভুরই অবতার। হিংসা, লোভ ও কামকে ইহারা নৈতিক পাপ মনে করেন। মন-বাক্য ও কর্মে এই সব দুর্নীতি পরিহার করা চাই। নীতিশুদ্ধি হইলেই প্রেমের পথ মুক্ত হয়। তখন প্রেমই পথ দেখায়।

আমরা বিভিন্ন মরমীয়া সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বাউল-সাধনার প্রকৃতি প্রকাশ করেছি। এবার শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ধারণার সঙ্গে কোথায় এ সাধনার মিল বা অমিল তা দেখতে চেষ্টা করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল প্রভৃতি মরমীয়া সাধকদের মতই শাস্ত্র ব্যাপারে সুপণ্ডিত ছিলেন না। ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং শুষ্ক পাণ্ডিত্যের[২৯] প্রতি গুরুত্ব তিনিও কোনদিন দেননি। আন্তরিকতা, ব্যাকুলতা[৩০] এবং তন্ময়তার প্রতিই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শাস্ত্র এবং বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান বাউল প্রভৃতি সাধকেরা যেমন উপেক্ষিত দৃষ্টিতে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তা দেখেন নি। কথামৃতের যে কোন পাঠকই শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্রবোধ দেখে বিস্মিত এবং পুলকিত হন। সহজ উপলব্ধির আলোতে শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতির যে চমৎকার ব্যাখ্যা এবং বিবৃতি দিয়েছেন তার তুলনা নেই এবং নিজের উপলব্ধির আলোতে তিনি এ সমস্ত শাস্ত্রমতের যে সমন্বয় প্রদর্শন করেছেন তা অনুপম। আমরা 'ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে এ বিষয় আলোচনা করেছি। এখানে একই বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় দর্শনের অধিকারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, অধিকারভেদে বিভিন্ন সাধক সাধনার বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে সার্থক হবেন। কোন কোন সাধকের পক্ষে মন্দির, মূর্তি,

২৯ শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা, বিবেক বৈরাগ্য চাই—কথামৃত, ১।১১।৩

৩০ 'ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়'— ঐ, ১।২।৬

আচার, বিচার সবই প্রয়োজনীয় আবার কারও পক্ষে এদের কোনটারই দরকার নেই।[৩১] যার পেটে যা সয় তার জন্য মা যেমন তা-ই রান্না করেন, সাধনার ক্ষেত্রেও ক্ষমতা এবং প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন পথ অনুসরণ করতে হয়।[৩২]

বাউল প্রভৃতি সাধকেরা যেমন মনের মানুষ মনেই খুঁজে পান বা মানুষের মধ্যেই সত্য নিত্য চিদানন্দময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, শ্রীরামকৃষ্ণও অনুরূপভাবে বলেন—'যত জীব তত শিব, জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ'[৩৩]; জীবের মধ্যেই শিব। পরবর্তীকালে এ-ধারণাই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত কবিতায়—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও জীবের মধ্যেই শিবের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তিনি আবার মন্দিরের বিগ্রহেও একই ঈশ্বরের অবস্থান মেনেছেন। তিনি নিজে ত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ। তিনি মূর্তি-পূজা করেছেন এবং মূর্তির মধ্যেই বিশ্বময়ীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার এই বিশ্বময়ী বিশ্বজননীই যে পরব্রহ্ম একথাও তিনি উপলব্ধি করেছেন, বলেছেন, 'যিনিই পরব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই মা'[৩৪]। কখনও গেয়েছেন, 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন' আবার কখনও গেয়েছেন—'হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ, দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন'[৩৫]।

৩১ 'সন্ধ্যাদি কতদিন? যতদিন না তাঁর পাদ পদ্মে ভক্তি হয—তাঁব নাম কইতে কবতে চক্ষের জল যতদিন না-পড়ে—আর শরীর রোমাঞ্চ যতদিন না হয়।'—কথামৃত, ২।১৯।৫

৩২ কথামৃত, ২।১৫।২

৩৩ ঐ ১ম ভাগ,.৯পৃঃ

৩৪ ঐ ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, ৫ম পৃষ্ঠা

৩৫ ঐ ১।১।৮

বাউলেরা যেমন মানুষের মধ্যে অতল সাগরের মর্ম-বোঝার আহ্বান জানিয়েছেন, কবীর যেমন কায়া সমুদ্রের তলায় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি রামপ্রসাদী গানে একই মনোভাব প্রকাশ করে গেয়েছেন—.

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।[৩৬]

সাধনার ক্ষেত্রে বাউলেরা, সুফীরা, খ্রীষ্টান মরমীয়ারা এমন কি মধ্যযুগীয় সন্তরা যে 'জ্যান্ত মরা' তত্ত্বের কথা বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তা স্বীকার করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁর সহজসিদ্ধ সরল ভাষা ও উপমার মাধ্যমে বলেছেন, 'জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয় গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হ'য়ে গেল। তার আর ভয় নাই। এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না —মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায়, তা হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয়।'[৩৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে যেমন অহং ত্যাগের কথা বলেছেন আবার অহং রূপন্তরের কথাও বলেছেন। তিনি বলেন, "দুই-একটি লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, 'অহং' ঘুরে ফিরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ী বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে। হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, 'আমি দাস', এইভাবে থাক। 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়।"[৩৮]

৩৬ কথামৃত, ১।১০।৭, ৩।১১।৩ প্রভৃতি
৩৭ ঐ ১।৪।৬
৩৮ ঐ ১।৪।৬

প্রসঙ্গটি আরও বিস্তারিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"জ্ঞান যোগ ভারি কঠিন। দেহাত্মবুদ্ধি না গেলে জ্ঞান হয় না। কলিযুগে অন্নগত প্রাণ—দেহাত্মবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি যায় না। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজ পথ। আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান লাভ করবে সন্দেহ নেই। যেমন জলরাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হয়েছে। যেন দুই ভাল জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। 'দাস আমি', কি 'বালকের আমি' এরা যেন 'আমি'র রেখামাত্র"।[৩৯]

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় এই যে, বাউল, কবীর প্রভৃতি মরমীয়া সাধকেরা প্রেমের ভিত্তিতে 'জ্যান্তমরা' তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন (একথা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছি), কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু জ্ঞানের দৃষ্টিতেই এ তত্ত্বের তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। ভক্তির দৃষ্টিতে অহং-ত্যাগ-এর দরকার হয় না, ভক্তের আমি কিছু খারাপ নয়, একথা বলেছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।[৪০]

বাউল প্রভৃতি সাধকেরা পরকীয়া সাধনাকে শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনেই সকল সাধনার সার্থকতা প্রদর্শন করে নিজের ভাব যে 'সন্তান ভাব' সে-কথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি শুষ্ক সন্ন্যাসী না হয়ে বসে বসে ভক্তিসুধারস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"ভক্তের ভাব কিরূপ জান? 'হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস,' 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান'।"[৪১] এই সন্তানভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ সাধনা। এভাব পরকীয়া ভাব থেকে স্বতঃই স্বতন্ত্র।

---

৩৯ কথামৃত, ১।৪।৬

৪০ 'এতে দোষ নাই, ববং এতে ঈশ্বর লাভ হয়'—কথামৃত, ১।৪।৭

৪১ কথামৃত, ১।২।৩

বাউলেরা পরকীয়া-পিয়াসী বলে গার্হস্থ্য জীবন তাঁদের কাছে খুব প্রিয় নয়। গার্হস্থ্য জীবনে মনের মানুষকে পাওয়া যেতেও পারে, নাও যেতে পারে, এমনি ধারণা বাউলদের। কিন্তু, এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা নেই। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, 'গৃহস্থাশ্রমেও ঈশ্বরলাভ সম্ভব',[৪২] শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই ত গৃহী ছিলেন। তিনি গৃহস্থদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—"তাঁকে জেনে,—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য কর।"[৪৩]

বাউল প্রভৃতি মরমীয়াবাদীর প্রেমের ভিত্তিতে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের মিলন সাধন করে বলেছেন—'নিত্য দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম'। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর বিশিষ্ট সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দ্বৈত এবং অদ্বৈত-তত্ত্বের সমন্বয় বিধান করেছেন। কিন্তু এ সমন্বয় বিধানের পথ বাউল-পথ থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকা-শক্তি মানতে হয়, দাহিকা-শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"[৪৪]

বাউল সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় সন্তরা প্রেমের পথে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রেমের মধ্যে কোন ভেদ নেই, সকলেরই এখানে সমান অধিকার, সুতরাং এদিক থেকে সকলেরই মিলবার সুযোগ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তি করেছেন

---

৪২ কথামৃত, ১।৯।২

৪৩ ঐ ১।৯।১

৪৪ ঐ ১।২।৪

নিজেরই ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ 'যত মত তত পথ' এই সত্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"একই ব্যক্তি; নামরূপভেদ। যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট; একঘাটে হিন্দুরা জল খায় তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায় তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'water'। তিনি একই, কেবল নামে তফাত। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ 'God', কেউ বলছে ব্রহ্ম; কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"[৪৫]

বাউল প্রভৃতি মরমীয়া সাধকেরা সকলেই সাধনার ক্ষেত্রে মন এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস মনের ঐকান্তিকতা, ব্যাকুলতা ও তন্ময়তা, এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই এক মত। মানুষ মনেই মুক্ত আবার মনেই বদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণও একথাই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন—"মন নিয়ে কথা। আবার মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙে ছোপাও সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুপবে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে ফুটফাট, ইটমিট। আবার পায়ে বুটজুতা, শিশ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেইরকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, ঈশ্বর চিন্তায়, হরিকথা এই সব হবে। মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। একজনকে একভাবে, সন্তানকে আর একভাবে, আদর করে। কিন্তু একই মন।"[৪৬]

---

৪৫ কথামৃত, ১।২।৪

৪৬ ঐ ১।২।৫

(৫)

আমরা প্রথমতঃ বাংলার বাউল-সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই সাধনার মূল সুর বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, মহাভারত ও পুরাণে কিভাবে ধ্বনিত হয়েছে তা দেখিয়েছি, পরে এই সুর আবার কেমন করে বিভিন্ন মরমীয়া সাধকদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাও প্রদর্শন করেছি এবং সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এই সহজিয়া সুরের কোথায় মিল কোথায় গরমিল তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। এই দীর্ঘ আলোচনা অনুসরণ করলে যে কোন পাঠকই স্বীকার কববেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সহজ সাধনার প্রকাশ যথেষ্টই লক্ষ্য করা যায়। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আচ্ছা, আমার এখন কি রকম অবস্থা তোমার বোধ হয়। শিষ্য বললেন—আপনার সহজাবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আপন মনে গানের ধুয়া ধরিলেন—"সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা।"[৪৭]

ব্যাকুলতা, তন্ময়তা, প্রেমবিহ্বলতা প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্বতঃই দৃষ্ট হ'ত তা নিশ্চয়ই সহজসাধকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শাস্ত্র সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার। সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বরলাভের জন্য। আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার,—দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ 'ত্যাগী, ত্যাগী'।"[৪৮] উপলব্ধির পথে শাস্ত্র-মর্ম কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রতিভাত হয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—"মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও,—পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব

৪৭ কথামৃত, ৩।১০।৫

৪৮ ঐ ৪।৬।২

জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।”[৪৯] এসব কথা আসলে মরমীয়া সাধকেরই কথা। তবে এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, বাউল প্রভৃতি মরমীয়া সাধকেরা শাস্ত্র প্রভৃতি সবই সাধনার পক্ষে অবান্তর বলে মনে করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেন না। অধিকারীভেদে কোন কোন সাধকের শাস্ত্রজ্ঞান প্রয়োজন। আর শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়, একথা ত সকল সাধকের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের বিধান।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই ভাবঘোরে বিভিন্ন রামপ্রসাদী গান গাইতেন। এদের মধ্যে কিছু কিছু গানের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানেও কয়েকটি গান তুলে দিচ্ছি। গানগুলোর মধ্যে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে আন্তরিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পুজোর বিভিন্ন বাহ্য উপচারগুলো আন্তরিক বিভিন্ন ভাবের প্রতীক বা symbol হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম ব্যবহার মরমীয়া সাধকদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

(১) ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তিচন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

(২) আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল, মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম-কল্পতরু মূলে বসে রই—যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, ধনি গো, ওফল গ্রাহক নই; যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে!

৪৯ কথামৃত, ৪।৯।২

(৩) শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ী ॥
কাক গণ্ডি মণ্ডী গাথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুড়ি সগুণে নির্মাণ করা, কারিগিরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ী।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে হেসে দেও মা হাত চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি গেল উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥

(৪) আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে (রে মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি জয়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা কায় শুধাবি।
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীতে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।

* * * *

(৫) গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
দয়াব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ॥

* * * *

(৬) ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমনি ভাব, তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয় ॥
কালিপদ সুধাহ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা হোম, যাগ, যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয় ॥

(৭) মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥

* * * *

(৮) প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

(৯) আমি সুরা পান করিনা, সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশাল দিয়ে,
জ্ঞান শুঁড়ীতে চোয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে বাউল এবং অন্যান্য মরমীয়া সাধকদের ভাব যথেষ্ট দেখা যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব সাধনার সাধক এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঋষি। তিনি সব সাধনার পথেই অগ্রসর হয়েছেন, সমস্ত সাধনা ও ধর্মই যে ঈশ্বর লাভের বিভিন্ন পথ, একথা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যেমন বাউল এবং অন্যান্য মরমীয়া সাধকদের বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, তেমনি আবার অন্য সাধনার ধারারও সঙ্গম লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানে এসে মিলিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছুই প্রত্যাখ্যান করেননি, সবই গ্রহণ করেছেন। 'যার পেটে যা সয়' এই তত্ত্ব অনুসারে তিনি অধিকারীভেদে বিভিন্ন সাধকের জন্য বিভিন্ন সাধনার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজের জীবনে সব সাধনাই যে সার্থক তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন।

বাউল প্রমুখ মরমীয়া সাধকেরা শাস্ত্র, ধর্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান, মন্দির, মসজিদ, মূর্তি প্রভৃতি অবান্তর বলে বর্জন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারীভেদে সবই গ্রহণ করেছেন। উচ্চাধিকারীর পক্ষে এগুলো অপ্রয়োজনীয় হলেও নিম্নাধিকারীর পক্ষে এদের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা প্রচার করেছেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে। একথা বলেই এই নিবন্ধের উপসংহার করি।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

অবতারবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

অবতারবাদ একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। ভক্ত বিশ্বাস করেন, ভগবান অপরিসীম করুণায় জীবের দুঃখ-দুর্গতি, অন্যায় বিপর্যয় এবং অসঙ্গত অত্যাচার দূর করার জন্য কখনও কখনও এই ধূলি-মলিন সংসারে অবতরণ করেন। করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের দুর্দিনে নির্বিকার থাকতে পারেন না, তাই তিনি আসেন দীনের কুটিরে মানুষের দেহ নিয়ে : লীলা করেন সাধারণ মানুষের মত।

ভক্তের এই বিশ্বাসের অন্য কোন কারণ আছে কি? ভক্ত ভাবেন, এই জগৎ ভগবানের সৃষ্টি। ন্যায়পরায়ণ এবং সর্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্টিতে অন্যায় হ'তে পারে না। যখনই অন্যায় মাথা তুলে দাঁড়ায় ভগবান তখনই আসেন এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য। মানুষের রূপ তিনি ধারণ করেন। এই মানবরূপী ভগবানকে লোকে বলে অবতার।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অবতারবাদের নিহিতার্থ-বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলেছেন—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥[১]

যখনি যখনি ধর্মের গ্লানি দেখা দেয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে

---

১ শ্রীমদ্ভগবদগীতা, চতুর্থ অধ্যায়, ৭ ও ৮নং শ্লোক।

তখনি তখনি আমি আবির্ভূত হই। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে আসি। অবতারতত্ত্ব এর চেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, সাধু এবং মহাপুরুষেরাই অবতার নন; এঁরা ভগবানের বিভূতি মাত্র। এই প্রসঙ্গে গীতার একটি বাণী স্মরণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন[২]—

যদ্ যদ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেববা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্ ॥

যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা অত্যন্ত শক্তিমান তাই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলে জানবে। এখানে সুস্পষ্টভাবেই বলা হচ্ছে, সাধু মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র এবং ভগবানের অংশ, কিন্তু অবতার নন।

অদ্বৈত বেদান্তে অবতারবাদ স্বীকৃত নয়। অদ্বৈত মতে—নির্গুণ ব্রহ্ম একমাত্র সত্য; সৃষ্টি বা জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যা জগতে সত্য ব্রহ্মের অবতরণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া ব্রহ্ম নির্গুণ বলে তিনি কখনই অবতরণ ক্রিয়ার কর্তা হ'তে পারেন না। অদ্বৈতাচার্য শঙ্কর 'লোকবত্তু, লীলাকৈবল্যম্' সূত্রের[৩] ভাষ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়া বিহারেষু ভবন্তি।' শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন ইচ্ছার ইঙ্গিত ছাড়াই স্বতঃ প্রবাহিত হয় তেমনি প্রয়োজন ছাড়া স্বভাবতঃই পরমেশ্বরের লীলামাধুর্য প্রকট হয়। তিনি আরও বলেছেন—'তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলম্, অপরিমিত শক্তিত্বাৎ'। এই প্রসঙ্গে শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে—'ন চেয়ং পরমার্থ বিষয়া সৃষ্টি-শ্রুতিঃ'। সৃষ্টি মায়ার কার্য, ব্রহ্ম মায়ার

২ শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা, দশম অধ্যায়, ৪১ নং শ্লোক

৩ শারীরক ভাষ্য ২।১।৩৩

অতীত। সেইজন্যই শঙ্করাচার্য মায়াতীতের মায়ায় অবতরণ প্রসঙ্গ আলোচনা করেননি। সৃষ্টি যদি পারমার্থিক সত্য হয় তবেই ব্রহ্মের অবতরণ সম্ভব। শঙ্কর অবতারবাদ প্রমাণ করার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ২।১।৩৩ সূত্রের অবতারণা করেন নি, ব্রহ্মাত্মবাদ প্রদর্শনের জন্যই এই এই সূত্রের আলোচনা। তবে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মায়িক অবতরণ বোধ হয় শঙ্করের অনভিপ্রেত ছিল না। কারণ, গীতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় 'জাত ইব' কথাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। শঙ্কর বলেছেন—'স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য স্থিতিং চিকীর্ষুঃ…স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি বলবীর্য তেজোভিঃ সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে।' তিনি আরও বলেছেন—'দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কিল সম্বভূব।' ভগবান বা সগুণ ব্রহ্ম নিজ মূল প্রকৃতি এবং মূল অজ্ঞানকে বশীভূত করে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, এখানে শঙ্কর একথাই বলেছেন। সুতরাং শঙ্করের মতে—পারমার্থিক দৃষ্টিতে বা পরমার্থতঃ ঈশ্বর নেই, সৃষ্টি নেই, তাঁর অবতরণও নেই; তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত হন, তিনি সৃষ্টি করেন এবং জনকল্যাণের জন্য অবতরণও করেন। অর্থাৎ, শঙ্করের অদ্বৈত দর্শনে অবতার অবিদ্যা জন্য বা মায়া নিবন্ধন হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর কোন পারমার্থিক সত্যতা নেই।

বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বেদান্ত দৃষ্টিতে সৃষ্টি মিথ্যা নয়। রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি কেউই জগৎকে মিথ্যা বলেন নি। তাঁদের মতে—ব্রহ্ম নির্গুণ নয়, সগুণ। এঁরা সকলেই সৃষ্টি সগুণ ব্রহ্মের সত্যিকারের কার্য বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের মতে—ঈশ্বরের লীলার অন্ত নেই। তিনি লীলাচ্ছলেই আবির্ভূত হন। বৈষ্ণবাচার্যেরা সকলেই অবতার মানেন এবং তাঁদের মতে

অবতার অসংখ্য। তবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণাবতার ('কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্')।

ডঃ সুশীল কুমার দে 'Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal' গ্রন্থে[8] অবতার সম্বন্ধে প্রধানতঃ আট রকম বৈষ্ণব মতের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন —"...We can summarise the theory of Avatara propounded by the Bengal School of Vaisnavism thus (*i*) The supreme being, though, one, can manifest in various forms...(ii) The Avatara is real and not illusory...". ডঃ দে'র মতে—বৈষ্ণবাচার্যেরা ভগবান বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন এবং তাঁর আবির্ভাব মায়িক বা আবিদ্যক নয়, সত্য, এ-কথা স্বীকার করেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুগে যুগে ভগবানের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন।[৫] বৈষ্ণবাচার্য জীব গোস্বামী 'অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব' এবং 'অপ্রাকৃতত্ব' এই দু'টি গুণ অবতার প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। অবতার সাধারণ মানুষের মত জীবদেহ ধারণ করে সাধারণ ব্যবহার করলেও তাঁদের অপ্রাকৃত কার্যকলাপও লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনপর্বতধারণ, পুতনাবধ, কালীয়দমন প্রভৃতি অপ্রাকৃতত্ব গুণের প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন আমরা অবতার প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি তাই তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন—"The theory of Avataras bring to mankind a new spiritual message ...An Avatara is a descent of God into man, and not an ascent of man into God...Yet an Avatara generally means a God how limits Himself for some

---

৪ পৃঃ ১৯০-৯১

৫ গীতা, চতুর্থ অধ্যায়, ৭ ও ৮ নং শ্লোক

purpose on earth and possesses even in His limited form the fulness of knowledge.'[৬] অবতারবাদ মানুষের কাছে এক নতুন আশার বাণী এনে দেয়। অবতার বলতে মনুষ্য রূপে ঈশ্বরের অবতরণ বোঝায়, মনুষ্যের দেবত্বে উন্নয়ন বোঝায় না। কোন কারণে ঈশ্বর নিজেকে সীমিত করেন, অসীম সীমার মধ্যে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁর পূর্ণ জ্ঞান নষ্ট হয় না। এই ত অবতারবাদের নিহিতার্থ।

সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষেরা দেবত্বে উন্নয়নের সাধনা করেন, কিন্তু তাঁরা দেবতার অবতরণ প্রকাশ করেন না। সেজন্যই তাঁরা অবতার নন। ডঃ অধরচন্দ্র দাসও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—'An incarnation is clearly distinguished from a saint or a divinely inspired person. A saint represents more an ascent of man to God than a descent of the Divine in him .'[৭]

অসীম, অনন্ত ও পূর্ণ পুরুষ সীমিত, সান্ত ও ক্ষুদ্র হয়ে মানুষের ঘরে জন্মান। মানুষের মত হাসেন, কাঁদেন, খান, ঘুমান। এই তাঁর লীলা। যুক্তি দিয়ে এ ব্যাপার বোঝা যায় না, অন্তর দিয়ে এ জিনিস অনুভব করতে হয়। সেজন্যই জ্ঞানবাদী শঙ্কর অবতারবাদ মানেন না, ভক্তিবাদীরা সবাই মানেন। এ জন্যই আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলেছি, অবতারবাদ একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। ডঃ অধরচন্দ্র দাস এ-কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—'The fact, however, remains that an incarnation is a man with full divine consciousness, wisdom and power, remaining at the same time the Creator, Ordainer and

---

৬ Indian Philosophy (Radhakrishnan', Vol, p 545.

৭ A Modern Incarnation of God (Dr. A. C. Das), p 3.

Preserver of the Universe. This is a mystery which no logic can penetrate.'[৮] ঈশ্বরের মনুষ্যরূপে অবতরণ একটি রহস্যময় ব্যাপার, যুক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভক্ত কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে দশাবতারের মধুর বর্ণনা দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতার ও শ্রীরাধা তাঁর সঙ্গিনী বলে স্বীকৃত। রসিক চূড়ামণি গৌরাঙ্গদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধার অবতার রূপে চিত্রিত হয়েছেন। মহাযান বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ প্রভৃতি প্রত্যেক বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধের অবতার নামে পরিচিত। 'পঞ্চরাত্র সংহিতা'য় ব্যূহের প্রসঙ্গচ্ছলে সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে প্রকারান্তরে কৃষ্ণ-বাসুদেবের অবতার বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, নবী বা পয়গম্বর অবতার নন। অবতার ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ নন, মনুষ্যরূপে স্বয়ং ঈশ্বর। এই দিক থেকে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে অবতারবাদ নেই। মহম্মদ পয়গম্বর বা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর নন।

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'Old Testament'-এ Messiah বা মুক্তিদাতার যে ধারণা পাওয়া যায় তা অবতার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। ইহুদীদের মতে—মুক্তিদাতা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ হবেন বটে, কিন্তু তিনি কখনই স্বয়ং ঈশ্বর হতে পারেন না। ইহুদীরা দীর্ঘকাল ধরে এই মুক্তিদাতার আবির্ভাবের প্রত্যাশায় পথ চেয়ে বসেছিল। মুক্তিদাতা ইহুদীদের বিদেশী দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে, এই ছিল ইহুদীদের আশা।[৯] ডঃ অধরচন্দ্র দাসও মুক্তিদাতা বা Messiah যে অবতার নন, এ-কথা স্বীকার করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন

৮ পূর্ববৎ, ৩ পৃষ্ঠা

৯ Wheeler Robinson : History of Israel, p 134, London, 1938.

—'The Jews never conceived, never could conceive the Messiah as God Himself born in flesh. He was just the Great One to be sent by, and act as deputy for God.'[১০] ইহুদীরা মুক্তিদাতাকে কখনই রক্ত-মাংসের মানুষরূপী ঈশ্বর বলে ভাবতে পারেনি, কখনও ভাবতে পারেনা ; তাদের মতে— মুক্তিদাতা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ এবং তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার অধিকারী।

খ্রীষ্টধর্ম কিন্তু অবতারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, যীশুখ্রীষ্ট স্বর্গীয় পিতার অবতার এবং সন্তান। পিতারূপী ভগবান (God the Father), পুত্ররূপী ভগবান (God the son) এবং পবিত্র ভূতরূপী ভগবান (God the Holy Ghost) একই ভগবানের তিনটি প্রকাশ। এই তিনের মধ্যে আসলে একই সত্তা প্রকাশিত। যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর স্বর্গীয় পিতা যে অভিন্ন, একথা স্বয়ং যীশু বলেছেন।[১১]

হিন্দুদের মত খ্রীষ্টানেরা অনেক অবতারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। খ্রীষ্টানদের মতে—ভগবান একবারই মাত্র পৃথিবীতে এসেছিলেন। সে আগমন হয়েছিল তাঁর খ্রীষ্টরূপে। সুতরাং খ্রীষ্টানদের মতে— একমাত্র খ্রীষ্টই অবতার ; খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বে কোন অবতার জন্মাননি, খ্রীষ্ট জন্মের পরেও কোন অবতার জন্মাবেন না।

আমাদের এই ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। ঈশ্বর যদি পৃথিবীতে অবতরণ আদৌ করেন, তবে তিনি একবার মাত্র অবতরণ করবেন কেন ? দুষ্কৃতিকারীর বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যদি ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় (একথা খ্রীষ্টানেরাও স্বীকার করেন), তবে তিনি শুধু একবারই-র আসবেন কেন ? ইতিহাসে যুগে যুগে

১০ A Modern Incarnation of God : A. C. Das, p. 10.

১১ 'I and my Father are one—Gospel, St. John 10.30.

দুষ্কৃতিকারীর তাণ্ডব এবং অধর্মের প্রাবল্যের পরিচয় মেলে। সুতরাং যুগে যুগে অবতারের অস্তিত্বের কথা আমরা মানবো না কেন? এই প্রসঙ্গে আমাদের একাধিক অবতারের ধারণা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

যুগে যুগে দেশের এবং সমাজের পরিস্থিতি বদলে যায়। ফলে যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনের ধরনও বদলাতে বাধ্য। সেজন্যই আমরা বিভিন্ন অবতারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করি। উদ্দেশ্য তাঁদের এক—ধর্মসংস্থাপন, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা পরিপূর্ণতা লাভের পথ-নির্দেশ, কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন পথ অনুসরণের আদেশ দিয়ে থাকেন।

অবতারেরা লোকগুরু এবং লোকশিক্ষক। তাঁদের অকথিত বাণী—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগরে সকল দেশ।' নানাদিক থেকে বিপন্ন, বিপর্যস্ত এবং দিশেহারা নরনারীর কাছে তাঁরা নিজ জীবন-দীপের আলো দিয়ে পথ দেখান। কাজ যখন শেষ হয় তখন তাঁরা দেহত্যাগ করেন। লোক-শিক্ষার জন্য অবতারের আগমন, লোকশিক্ষা-শেষে তাঁর তিরোধান।

(২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারবাদ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "তিনি (ভগবান) মানুষ হোয়ে—অবতার হ'য়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।"[১২] শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, অবতারবাদ অদ্বৈত দৃষ্টিতে সিদ্ধ নয়, ভক্তের কাছে ভক্তির দৃষ্টিতে অবতারের তাৎপর্য ধরা পড়ে। সেজন্যই তিনি কাশীপুরের বাগানে স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং

১২ কথামৃত, ৩।২৪।৩

রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।' কথাটি নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

একদিক থেকে এই কথার মধ্য দিয়ে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিচ্ছেন অবতাররূপে। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলছেন, রাম এবং কৃষ্ণের মত যুগ প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব; রাম এবং কৃষ্ণের মত তিনিও অবতার। অন্যদিক থেকে অদ্বৈত দৃষ্টিতে একথার যে তাৎপর্য নেই স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই তা বলে দিচ্ছেন। কথার নিহিতার্থ এই, ভক্তেরাই অবতারবাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব মানবেন, যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপার বোঝাও যাবে না, বোঝানও যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—"তিনি (ঈশ্বর) যদি দেখিয়ে দেন এর নাম অবতার,—তিনি যদি তার মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তা হ'লে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্ করে আলো যদি তিনি দেন, তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?"[১৩]

বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করে তাঁর অবতারত্ব লোককে দেখান তবেই লোকেরা অবতারের অস্তিত্ব বুঝতে পারে। বিচার করে, তর্ক করে তাঁকে জানা যায় না। ভক্তের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের কৃপার সম্মিলিত শক্তিতেই অবতার-এর মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

যারা অবতার মানে না তাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তিনিই (ভগবান) স্বরাট, তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, একথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বলতে পারি?"[১৪] তিনি আরও বলেন—"আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

১৩ কথামৃত, ১।১৪।১০

১৪ ঐ ১।১৫।৩

এসব কথা কি ধারণা হ'তে পারে ? একসের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ? তাই সাধু মহাত্মা যারা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস কর্তে হয়।"[১৫]

ভক্তেরা অবতার চান কেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করবার জন্য। তাঁকে দর্শন করলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য্য যেন উদয় হ'ল।…সভাস্থ সকলের হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'ল। সূর্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।"[১৬] বক্তব্যের নিহিতার্থ, অবতারের প্রভাবে জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি সহজলভ্য হয়।

অবতারদের সবাই চিনতে পারে না। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময় একমাত্র পূর্বদেশের কয়েকজন পণ্ডিতই (Magi) তাঁকে দেব শিশু বলে চিনতে পেরেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেন, "অবতার যখন আসে, সাধারণ লোক জানতে পারে না—গোপনে আসে। দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত জানতে পারে। রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারজন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিল, "হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি।"[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে—অবতারেরা স্বয়ং ভগবান হলেও লোক-শিক্ষার্থে সাধনভজন করে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন—"ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন।"[১৮]

---

১৫ কথামৃত, ১।১৫।৩
১৬ ঐ ২।২।৩
১৭ ঐ ২।২।৩
১৮ ঐ ২।১৯।৩

সিদ্ধ হবার পরও অবতারেরা কখনও কখনও দেহত্যাগ করেন না। লোকশিক্ষার জন্য দেহধারণ করেই থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "সমাধি হবার পর, প্রায় শরীর থাকেনা। কারু কারু লোক-শিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন চৈতন্যদেবের মত অবতারদের।"[১৯]

সাধক এবং মহাপুরুষ সকলেই অবতার নন। সাধারণ সাধকেরা নিজের মুক্তিই পেতে পারেন, কিন্তু অবতারেরা অন্যের মুক্তিবিধানের প্রয়াস করেন। কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণ একটি চমৎকার উপমা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়, কিন্তু একটা পাখী এসে বসলে ডুবে যায়।...কিন্তু এ কাঠ (বাহাদুরি কাঠ) নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।"[২০] হাবাতে কাঠ হচ্ছে সাধারণ সাধক, আর বাহাদুরি কাঠ অবতারের দল।

"রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন, অসংখ্য অবতার এক ঈশ্বর থেকে রূপ পরিগ্রহ করেন।"[২১] তিনি বলেন, 'থোলো থোলো রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ'। যুগ প্রয়োজনে তাঁদের আগমন এবং লোক-শিক্ষা তাঁদের কাজ।

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' নিজের অবতারত্ব তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু একথা তিনি বলেছিলেন জীবন-সায়াহ্নে কাশীপুরের বাগানে তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেনকে। এর অনেক পূর্বেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই ভৈরবী ব্রাহ্মণীই

---

১৯ কথামৃত, ১।৩।৬

২০ ঐ

২১ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : তীর্থরেণু, ৩১৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের প্রথম প্রচারক। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় হয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই মথুরবাবুর (রাণী রাসমণির জামাতা) সম্মুখে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন —"এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"

ভৈরবী তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণীয়। তিনি 'My master' নিবন্ধে বলেছেন—Later on this saint (শ্রীরামকৃষ্ণ) used to say about her (ভৈরবী) that she was not only learned but she was the embodiment of learning. She was learning itself in human form. ভৈরবী শুধু জ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মূর্তিমতী জ্ঞান। 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে'[২২] তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দেবভাষা বিশারদা বিশেষ প্রকারে
সুগূঢ় শাস্ত্রের বাক্য ভাল ব্যাখ্যা করে।
তন্ত্রগীতা পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থ যত
অক্ষর অক্ষর তার সব কণ্ঠস্থিত।

* * *

প্রভু বলিতেন চারিবেদ মূর্তিমতী।

তন্ত্রের সাধনাঙ্গেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে তিন বছর ধরে (১৮৬১-৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রের দুরূহ সাধনা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে বৈষ্ণব ভক্তি সাধনায়ও দীক্ষিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনস্বী লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন—"ভৈরবী শুধু সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার পুরুষ বলেন নাই, তাঁহার ধর্ম জীবনের বিভিন্ন মুখী বিচিত্র

২২ শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, ৭৪ পৃষ্ঠা

অভিজ্ঞতা অর্জনে স্বামী বিবেকানন্দের মতে সর্বপ্রথম সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি গুরুভাবেই শিষ্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন, 'উহার (শ্রীরামকৃষ্ণ) চক্ষুদান ত আমিই করিয়াছি।'"[২৩]

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার ঘোষণা করেই তাঁর কাজ শেষ করেননি। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি মন্থন করে পণ্ডিতদের কাছে তা প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'রামকৃষ্ণ পুঁথি'[২৪]র নিম্নলিখিত অংশ—

আসুন বিচার রণে থাক কেহ যদি।
খণ্ডিব তাঁহার তর্ক হইলে বিরোধী॥
এত বলি তপস্বিনী ব্রাহ্মণী বাখানে।
একত্রিত সমবেত সভা বিদ্যমানে॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার বলে প্রচার করেছিলেন। ঠিক তাঁর মতই ভৈরবী ব্রাহ্মণী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম অবতার বলেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মতে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বের উদ্দেশ্য 'জীব উদ্ধার'। পরবর্তীকালে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রসঙ্গে নূতন আর একটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন। 'স্বাদিতে নিজ মাধুরী' হচ্ছে এই নূতন উদ্দেশ্য। রায় রামানন্দের মতে স্বয়ং ভগবান নিজ মাধুরী আস্বাদন করার জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রসঙ্গে অনুরূপভাবে বিবেকানন্দও সমষ্টি মুক্তির কথা তুলে শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্যের নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে মনস্বী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর ভাষা উদ্ধার করে বলা যায়— "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্বের অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ করিয়া গিয়াছেন

২৩ গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী : শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে, ৬-৭ পৃষ্ঠা

২৪ রামকৃষ্ণ পুঁথি ৭৬ পৃষ্ঠা

সমষ্টিভাব—ইতিহাস পথে সমগ্র 'জাতির উদ্ধার'।"[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন—"বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন। কিন্তু…বর্তমান গভীর বিষাদ রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা ইতিপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য। সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জলতায় আর্য সমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমাহীন হইবে। এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃ পুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলা প্রায় হইয়া যাইবে।"

ভৈরবীর সমসাময়িক আর একজন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই ব্যক্তির নাম গৌরী পণ্ডিত। একদিন হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরী পণ্ডিতকে বলেন—"শুনেছ ব্রাহ্মণী কিবা মোর কথা বলে? গৌরাঙ্গের অবতার নিতাইয়ের খোলে।" একথা শুনে গৌরী পণ্ডিত বলেন—

"যে শক্তি সম্পন্ন হ'লে অবতার গণি
আমি জানি আপনিই সে শক্তির খনি॥"[২৬]

এই কথার মধ্যে বৈষ্ণবদের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' এই ধারণার অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীজীব গোস্বামী ষট্ সন্দর্ভের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান, তিনি অবতার নন। অবতারেরা অংশ মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ। এর অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের মতে অবতারের খনি। অবতারেরা ভাগবতের ভাষায় 'এতেশ্চাংশ কলা পুংসঃ'। গৌরী পণ্ডিত বোধ হয় এই অর্থেই

---

২৫ গিরিজা শঙ্কর রায় চৌধুরী : শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে, ৮ পৃষ্ঠা

২৬ রামকৃষ্ণ পুঁথি, ৮২ পৃষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারের খনি বলেছেন। আমরা অবশ্য মনে করি, অবতার স্বয়ং ভগবানেরই আবির্ভাব প্রকাশ করে ; অবতার ভগবানের অংশ নন, তিনিই অবতার। ভগবানের অংশকে বিভূতি বলা হয়েছে ভগবদগীতায়। এই প্রসঙ্গ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তা যা হোক, গৌরী পণ্ডিত ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মতই শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে উল্লেখ করেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে বলেছেন—"একটা ধর্ম বা সাধনার ধারা চলতে চলতে তার course-এর (ধারা বা প্রবাহের) মধ্যে মাঝে মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনের সময় সমগ্র বিশ্বে একটা আলোড়ন, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির ভাব দেখা দেয়। একেই বলে ধর্মগ্লানি। ধর্ম বা ধর্ম সাধনার যা-কিছু ভাল তাকে ত্যাগ করে মানুষ তখন অসচ্ছল পথে চলতে থাকে আর তখনই কোন মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়।...তাঁকে শাস্ত্রে ...অবতার...আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যিনি সত্যকে জীবনে যথার্থ-ভাবে উপলব্ধি করেন তিনিই সত্য প্রচার করার অধিকারী। অবতারদের তাই আধিকারিক পুরুষ বলে।...মানুষকে ধর্মের বা সত্যের নূতন আলোক দেবার জন্য তাঁরা মানুষের মত রূপ ধারণ করে আসেন। তাতে তাঁদের নিজেদের কোন অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি থাকে না, জীবের কল্যাণসাধন হয় একমাত্র ব্রত। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের মর্মকথা তাই। সনাতন সত্যকে উপলব্ধি করে মানুষ পরম কল্যাণের অধিকারী হোক এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সত্যলাভ করার পথকে তিনি নতুনভাবে এ যুগে প্রচার করলেন।"[২৭] স্বামী বিবেকানন্দও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেন—"Another point, it was no new truth that Ramkrishna Paramhansa came to preach, though his advent

২৭ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : তীর্থরেণু, ২৭৭-৭৯ পৃষ্ঠা

brought the old truths to light. In other words, he was the embodiment of all the past religious thought of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant."[২৮] শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে পুরাতন সত্যগুলো নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভারতের অতীত ধর্মচিন্তার প্রতিমূর্তি স্বরূপ। শাস্ত্রের তাৎপর্য তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমেই অনেকের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ আরও বলেছেন—"শ্রীশ্রীঠাকুর ত মোটেই লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু সকল ধর্ম ও সাধনার ভিতর এক শাশ্বত সত্য আছে একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। চৌষট্টিখানি তন্ত্র সাধন করেও তিনি খৃষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব ও বেদান্ত সকল রকম মতের সাধন করে দেখলেন সত্য বা লক্ষ্য সবারই এক, পথ বা প্রণালী কেবল আলাদা। তিনি প্রচারও করলেন: "যত মত তত পথ,"—সকল ধর্ম ও সাধনার ভিতর সত্য এক, পথই কেবল ভিন্ন ভিন্ন। এখানে ধর্ম বলতে ধর্মমত ও পথ, নচেৎ আসল ধর্ম ত এক, অখণ্ড ও সার্বভৌমিক। শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মমতকে পথ বলেছেন। সম্প্রদায়ভেদে ধর্মমত অসংখ্য। আমরাও তাই বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, গৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ এঁদের সকলের পূজা করি এবং সকলকেই সম্মান ও সমান শ্রদ্ধা দান করি।"[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ ধর্ম মহাসম্মেলনে সর্বধর্মের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করে সকলের প্রশংসাভাজন হতে পেরেছিলেন। একথা এত পরিচিত যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

---

২৮ **Complete works of Swami Vivekananda, Vol VI, p 276.**

২৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ: তীর্থরেণু, ২৩৯ পৃষ্ঠা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতে যে একটা যুগ সন্ধিক্ষণের আবির্ভাব হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সনাতনপন্থীরা আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের বেড়াজালে ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। মৃত ধর্ম তখন কতকগুলো কুসংস্কাররূপে ভূতের মত মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। শাস্ত্রগ্রন্থ সব অপব্যাখ্যায় কিম্ভূত মূর্তি ধারণ করেছিল। অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষার আলো তখন সবেমাত্র দেশে প্রবেশ করেছে। একদল তরুণ এই আলোর সন্ধান পেয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটেছে তার পেছনে। নিজেদের পিতৃপিতামহের সাধনা ও সংস্কৃতি কুসংস্কার বলে প্রত্যাখ্যান করে তারা সাগর পারের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে। একদিকে সনাতন-পন্থীদের ধর্মের শব-সাধনা, অন্যদিকে নব্যপন্থীদের জীবন-জোয়ার সমগ্র দেশে এক ঘোরালো পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এই দুর্যোগের অন্ধকারে মানুষ সনাতন ধর্মের আনন্দ ও অমৃতরূপ চিনতে না পেরে তাকে জঞ্জাল বলে পরিত্যাগ করার কথা ভাবছিল। কেউ কেউ ইংরেজী শিক্ষাবাহিত পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার মধ্যে মুক্তির আলো দেখছিল। সে আলো অনেকের কাছেই আলেয়ার ভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমণি দেবীর সন্তানরূপে গদাধর চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ পরমহংস) আবির্ভূত হন। তৎকালে ভারত তথা বাংলার দুর্যোগের ঘনঘটার দিনে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ব্যাপারে তিনটি আন্দোলনের আলোক ধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আমরা রাজা রামমোহন পরিচালিত 'ব্রাহ্ম আন্দোলন' বা বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্ম প্রচার, আচার্য দয়ানন্দের 'আর্য সমাজ' স্থাপন ও বেদ প্রচার এবং ম্যাদাম ব্ল্যাভৎসৃকি (Madame Blavatsky) প্রচারিত 'থিওসফি আন্দোলন'-এর কথা বলছি।

রাজা রামমোহন হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে[৩০] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী পারসী, সংস্কৃত, হিব্রু ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষা খুব ভাল করে আয়ত্ত করেছিলেন। তার ফলে তিনি ইসলাম, হিন্দু এবং খ্রীষ্টধর্মের মূল গ্রন্থ পাঠ করে ধর্ম ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন 'তুহ্ফৎ-উল-মুবহিদ-উদ্দিন' (Tuhfat-ul-Muwahid-uddin) গ্রন্থে। এই গ্রন্থ পারসীতে লেখা, কিন্তু এর ভূমিকা লেখা আরবীতে। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়। রামমোহন বলেছেন, বিভিন্ন ধর্মের বহিরঙ্গগত পার্থক্য থাকলেও স্বরূপগত ঐক্য খুবই লক্ষ্যণীয়। তাঁর মতে একেশ্বরের ধারণা এবং তাঁর উপাসনার কথা সর্বধর্মেই স্বীকৃত। সমস্ত ধর্ম প্রবক্তারাই এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা রকমের ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার এবং আচার অনুষ্ঠান ধর্মের কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল ঘোলা করে ফেলেছে। এভাবেই একেশ্বরবাদে বিশ্বাস এবং একেশ্বরের উপাসনায় বিশ্বাস রামমোহনের ধর্ম-ধারণার ভিত্তি হয়ে উঠেছে। তিনি হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ এবং উপনিষদ পাঠ করে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এই ধারণাই যে প্রকৃত হিন্দু-ধারণা, একথা প্রচার করতে লাগলেন। মূর্তিপূজা বেদ বা উপনিষদ সমর্থিত নয়। একেশ্বরের উপাসনাই একমাত্র উপাসনা। সুতরাং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে একেশ্বরের আরাধনা করাই প্রকৃত ধর্ম-চারণা, একথা রামমোহন কম্বুকণ্ঠে প্রচার শুরু করে দিলেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি 'ওঁ' বচন এবং ব্রাহ্মণের নিত্য পাঠ্য গায়ত্রীর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং একেশ্বরের নিকট প্রার্থনাই যে উপাসনার উৎকৃষ্ট উপায়, একথা ঘোষণা করলেন।[৩১] ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট রামমোহন ধর্ম

৩০ রামমোহনের জীবনী কারিনী মিস কোলেট-এর মতে রামমোহন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে জন্ম গ্রহণ করেন।

৩১ English Works, p 81-86.

সম্বন্ধে এই ধারণার ভিত্তিতে ব্রাহ্ম সভা বা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। রামচন্দ্র শর্মা এই সভায় সর্বপ্রথম আচার্যের কাজ করেন এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎকালীন বাংলা দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তি কবি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের এই সমাজ-এর সঙ্গে প্রথম থেকেই সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী ব্রাহ্ম মতে সর্বসাধারণের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয়।[৩২] এই মন্দিরে উপাসনার সময় গীত হবার জন্য রামমোহন সংগীত রচনা করেন।

প্রচলিত হিন্দু ধর্মের সংস্কার-কর্মে তৎকালে আর একজন মনীষীর নাম অবিস্মরণীয়। তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের কাথিওয়াড় রাজ্যে এক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম।[৩৩] দয়ানন্দ ভারতের অরণ্য পর্বতে পরিভ্রমণ করে হিন্দুদের বিভিন্ন দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি শাস্ত্র পাঠের জন্য মথুরায় প্রখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত স্বামী বিরজানন্দের চরণোপান্তেও উপনীত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল স্বামী বিরজানন্দের নিকট পাণিনি, উপনিষদ, মনুসংহিতা এবং বিভিন্ন দর্শন পাঠ করেন। এই সমস্ত শাস্ত্রে দয়ানন্দজী গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। স্বামী বিরজানন্দের কাছ থেকে চলে আসার আগে দয়ানন্দ তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি বেদের যথার্থ ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং অন্যান্য ধর্মের আক্রমণ প্রতিহত করে দিকে দিকে বৈদিক ধর্ম প্রচার করবেন। দয়ানন্দজী তাঁর জীবনে এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছিলেন।

স্বামী বিরজানন্দের কাছে শিক্ষা শেষ করেই দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মের

৩২ ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস : শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রথম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৩ **M. Z. S. Nigama : Vedic Religion and its Expounder Swami Dayananda Saraswati**, ১ম পৃষ্ঠা ; লাজপৎ রায় : আর্য্য সমাজ, ৩ পৃষ্ঠা।

সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মূর্তিপূজার স্থানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এবং বৈদিক ধর্মের প্রচার শুরু করলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩৪]

এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে—দয়ানন্দ যদি রামমোহনের মতই মূর্তি পূজার বিরোধী এবং বেদ-উপনিষদ ভিত্তিক ধর্মে বিশ্বাসী হন তবে তিনি রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান না করে আর্য সমাজ গড়ে তুললেন কেন ?

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, রামমোহন ও দয়ানন্দের চিন্তা-ধারার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও গভীর পার্থক্যও ছিল। বিশেষ করে রামমোহনের পরবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন-এর মত প্রধানদের সঙ্গে দয়ানন্দের মতভেদ সুস্পষ্ট।

রামমোহনের দৃষ্টিতে কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত নয়, এমনকি বেদকেও অভ্রান্ত বলে মেনে নেবার কারণ নেই। শাস্ত্র যুক্তিগ্রাহ্য হলেই গ্রহণযোগ্য হবে। বেদের যে অংশ যুক্তি-সমর্থিত আমরা তাই সত্য বলে মানবো। যুক্তিতে না টিকলে কোন কিছুই বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় বেদ ও উপনিষদের সত্যগুলো পুনঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের চরম সত্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৩৫] কেশবচন্দ্র সেনও এই মতেরই সমর্থক ছিলেন।[৩৬] দয়ানন্দের কাছে বেদ ছিল সমস্ত সংশয়ের অতীত ও অভ্রান্ত। বেদ সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করার অবকাশে তিনি ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। বেদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা তিনি

---

৩৪ সত্যার্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা ।।৶৹

৩৫ অজিত চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯৫ পৃষ্ঠা ও ২১১ পৃষ্ঠা

৩৬ জীবন বেদ, ৪১ পৃষ্ঠা

অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন এবং নিত্য উপাসনায় এদের অঙ্গীভূত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনা ব্যতীত অন্য সব কিছুই অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর বলে মনে করতো। সুতরাং এই দিক থেকে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে দয়ানন্দের চিন্তাধারার পার্থক্য সুস্পষ্ট। এজন্যই দয়ানন্দ 'আর্যসমাজ' নামে একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। দয়ানন্দের ধর্ম সম্পর্কে ধ্যান ও ধারণার ভিত্তিতে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বামী দয়ানন্দ 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থই আর্যসমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই গ্রন্থে দয়ানন্দ বৈদিক ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম এবং প্রচলিত পৌত্তলিক হিন্দু-ধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম সবই অবৈদিক এবং অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন। ইসলাম ধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম যেমন প্রত্যেকেই একমাত্র সত্যধর্ম বলে নিজেদের প্রচার করে, দয়ানন্দও বৈদিক ধর্মকে একমাত্র সত্যধর্ম বলে তীব্র ভাবে প্রচার করেছেন। বেদকে তিনি স্বতঃই প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বৈদিক দেবদেবী এবং যজ্ঞের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ম্যাক্সমুলার বা শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলেনা। বেদের কোন্ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত, এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক ভাবেই ওঠে। কেউ যদি দয়ানন্দকৃত বেদ-ভাষ্য গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে তাকে কিছু বলার নেই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ্য। স্বামী দয়ানন্দ অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ মানতেন না এবং স্বর্গ নরক প্রভৃতির ধারণায়ও অবিশ্বাসী ছিলেন।[৩৭]

উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম বিজ্ঞান বিশেষ করে অভিব্যক্তি-

---

৩৭ সত্যার্থ প্রকাশ, ৬৭২-৩ পৃষ্ঠা এবং শঙ্কর নাথ পণ্ডিত কৃত দয়ানন্দ জীবন চরিত, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

বাদের কাছে রূঢ় আঘাত পেয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধর্মে অবিশ্বাস দেখা দেয়। চারদিকের ধর্মে অবিশ্বাসের হুজুগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমেরিকায় থিওসফিকেল সমাজ (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যাডাম ব্ল্যাভৎস্কি (Madame Blavatsky) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের বেদ ও উপনিষদের শিক্ষাই এই সমাজের ভিত্তি। 'থিওসফি' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান। থিওসফি-মতে মানুষ স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক বলে সহজেই ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে থিওসফি দলের মিসেস বেসান্ত (Mrs Anuic Besant) বলেন, "...Man being a spiritual being and the spiritual nature being the profoundest part of himself, by the unfolding of that, by the knowledge, in the deepest sense, of himself, man is able to reach the knowledge af the supreme, of the universal life."[৩৮]

থিওসফি ধর্মের স্বরূপ এবং বহিরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করে। থিওসফি মতে ধর্মের স্বরূপের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত, ধর্মের বহিরঙ্গ বর্জনীয়। থিওসফি এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কর্মবাদ, অবতারবাদ, ত্রিলোকবাদ (ভূলোক, নক্ষত্রলোক ও স্বর্গলোক), অতিমানববাদ (দেব, দেবদূত, সর্বশ্রেষ্ঠ দেবদূত এই তিন প্রকার অতিমানবে বিশ্বাস) প্রভৃতিও থিওসফি মতের অঙ্গীভূত। এই সব মতবাদের ভিত্তিতে থিওসফি সার্বজনীন ধর্ম এবং সকলেরই গ্রহণীয়, একথা থিওসফি সমর্থকেরা প্রচার করেছেন।[৩৯] এইক্ষেত্রে

৩৮ Theosophy : Its Meaning and Value ৫ পৃষ্ঠা

৩৯ Ibid ৩৯ পৃষ্ঠা

লক্ষ্যণীয়, থিওসফি মতের অধিকাংশই ভারতের উপনিষদ, বৌদ্ধ মতবাদ এবং তন্ত্র থেকে গৃহীত। সেজন্য আমেরিকায় উদ্ভূত হলেও আসলে থিওসফি ভারতীয় চিন্তায় সমৃদ্ধ।

স্বামী দয়ানন্দ একসময় থিওসফি মতের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। থিওসফি মতের একেশ্বরবাদ, বেদ-বিশ্বাস প্রভৃতি দয়ানন্দের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি নিজেও এই মতই প্রচার করতেন। দয়ানন্দের পাণ্ডিত্যের কথা বিদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। ম্যাদাম ব্ল্যাভৎস্কি (Madame Blavatsky) ভারতে একটি থিওসফি-কেন্দ্র স্থাপন করার কথা ভাবছিলেন। তিনি এই ব্যাপারে দয়ানন্দের সাহায্য পাবেন আশা করলেন। এদিকে আবার দয়ানন্দ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাদাম ব্ল্যাভৎস্কির কাছে চিঠি লিখে তাঁর আর্য সমাজ থিওসফি সমাজভুক্ত হতে চায় বলে জানালেন।[৪০] আর্য সমাজের নাম হ'ল 'আর্যাবর্তস্থিত আর্য সমাজের থিওসফি সমাজ' (The Theosophical Society of the Arya Samaj of Aryavarta)। স্বামী দয়ানন্দ আমেরিকা, য়ুরোপ এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের থিওসফি কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা বলে স্বীকৃত হলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাদাম ব্ল্যাভৎস্কি ভারতবর্ষে এসে দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। এরপর আর্য সমাজ থিওসফি সমাজ থেকে বেরিয়ে এল। দয়ানন্দ থিওসফি-সমর্থিত ত্রিলোকবাদ, অতিমানব-বাদ প্রভৃতি পৌত্তলিকতার নামান্তর বলে উপলব্ধি করলেন। তিনি পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী বলে থিওসফিরও ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। এমনি করে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম, আর্য সমাজ-সমর্থিত বৈদিক ধর্ম এবং থিওসফিবাদ প্রতিষ্ঠা পেল।

৪০ দয়ানন্দ সরস্বতী : নিগম, ১৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন দৃষ্টিতে যুগসমস্যা অবলোকন করলেন এবং সে সমস্যার এমন সমাধান দিলেন যা অভূতপূর্ব অথচ অব্যর্থ। আমরা কিছু আগেই স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কথায় এই সমাধান-প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এবার এ বিষয়ে আমাদের কথা বলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম ব্যাপারে প্রচলিত কোন মত বা পথকেই ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করেন নি। রামমোহন বা দয়ানন্দ মূর্তিপূজোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মূর্তির পূজো করেছেন সানন্দে ; জোর দিয়ে বলেছেন—"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী"।[৪১] হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজো অনাবশ্যক, অযৌক্তিক ব্যাপার বলে মনে করেছেন রামমোহন ও দয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন এবং লোকশিক্ষার জন্য নিজের জীবনেই এ সত্যের অনুশীলন করে সার্থক হয়েছেন।

মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং নিজ উপলব্ধির জোরে সমস্ত অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাসের ঢেউ তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথ সংবাদ আলোচনা করা যেতে পারে। নরেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রথম জীবনে ধর্ম ব্যাপারে সংশয়বাদী ছিলেন। ঈশ্বর আদৌ আছেন কি-না, এবিষয়ে তাঁর প্রবল সংশয় ছিল। সেজন্যই তিনি ঈশ্বর কেউ দেখেছেন কি-না, এ-প্রশ্ন নিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত ধর্মনেতাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ; কিন্তু কেউ তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। সর্বশেষে তিনি গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত সহজভাবে বললেন—"আমি যেমন তোকে দেখছি তেমনি তাঁকে দেখেছি রে, দেখেছি আরও স্পষ্ট করে।"[৪২]

৪১ কথামৃত, ১।২।৪

৪২ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol III, 6th edn. p 346.

নরেন্দ্রনাথ হটবার পাত্র নন। তিনি বললেন—'আমাকে দেখাতে পারেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে স্পর্শ করলেন, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বভুবনে চৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হলেন।

তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের ধর্মগ্লানির দিনে এমনি এক পুরুষের আবির্ভাব প্রয়োজন ছিল। যুগ-প্রয়োজনে আবির্ভূত এই পুরুষকে বিশ্ববাসীরা অবতার বলেছিলেন। তিনি পুরাতন ও প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস পরিত্যাগ করার উপদেশ দেননি, বর্জন তাঁর নির্দেশ নয়, গ্রহণ তাঁর বাণী। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে, ইহুদীদের দুর্দিনে ঈশ-পুত্র যীশুর আবির্ভাবের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'I have came not to destroy but to fulfil', আমি ধ্বংস করতে আসিনি, অপূর্ণতা দূর করতে এসেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘকাল পরে বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় এই বাণীই প্রচার করেছেন। যীশু যেমন গল্পের (parables) মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি গল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ অথচ অত্যন্ত হৃদয়-স্পর্শী করে সনাতন সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি আমাদের বিভিন্ন দর্শন এবং ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য এমন সহজ করে বলতেন যার তুলনা নেই। সকলের বোধগম্য করে অত্যন্ত দুর্বোধ্য তত্ত্ব প্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। সেজন্যই বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'His life alone made me understand what the Shastras really meant.'[৪৩] একথা শুধু বিবেকানন্দের কথা নয়, বোধ হয় অধিকাংশ ভারতবাসীরই অন্তরের কথা। আমাদের ধর্মের নিহিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে প্রচার করেছেন তাতে আমাদের ধর্মের যৌক্তিকতা এবং উপাদেয়তা আমাদের সকলের বোধগম্য হয়েছে। দুর্ব্যাখ্যা এবং অপব্যখ্যার আড়ালে অন্তর্হিত শাস্ত্রের দিব্যজ্যোতি তাঁর

---

৪৩ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol VI, p 276.

জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত মত ও পথ অনুসরণ করে নিজের জীবনেই সার্থকতা লাভ করেছিলেন। সেজন্যই তিনি নিজ উপলব্ধির আলোতে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা সকলের গ্রহণীয় করে প্রচার করতে পেরেছিলেন। থিওসফি মতে সর্বধর্মের সার গ্রহণের চেষ্টা আছে। এই দিক থেকে থিওসফি মতকে সমন্বিত ধর্ম বা eclectic religion[৪৪] বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছিলেন তা কোন সমন্বিত ধর্ম নয়। সমস্ত ধর্মই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সুতরাং যে কোন লোক যে কোন ধর্ম অনুসরণ করেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। সমস্ত ধর্মের সার সংকলন করে নূতন ধর্ম স্থাপন করার পরিকল্পনা শ্রীরামকৃষ্ণ করেন নি। এই পরিকল্পনা রামমোহনের ছিল। আমরা একথা 'রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। থিওসফি মতেও এ পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা ত এই মাত্র বললাম। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত সাধন পথেই সিদ্ধি সম্ভব বলেন, তখন তিনি এই সমস্ত পথ একত্র করার কথা বলেন না। তাঁর বক্তব্য—সাধক নিজ ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুসারে যে কোন পথ অনুসরণ করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। বিভিন্ন ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের মতে—ঈশ্বর প্রাপ্তির বিভিন্ন পথ যেমন জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' এই বাণী এভাবে বুঝতে হবে। অনেকে মনে করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ধর্ম একত্র করার কথা বলেছিলেন; সমন্বয় বলতে এঁরা একীকরণ বোঝেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যের এই ব্যাখ্যা আমরা অসঙ্গত বলে মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন—"যার

৪৪ A. C. Das: A Modern Incarnation of God, p. 107

যেমন রুচি। আবার যার যা পেটে সয়। একটা মাছ এনে মা ছেলেদের নানা রকম করে খাওয়ান। কারুকে পোলাও করে দেন; কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না। তাই তাদের মাছের ঝোল করে দেন। যার যা পেটে সয়। আবার কেউ মাছ ভাজা, মাছের অম্বল ভালবাসে। যার যেমন রুচি।”[৪৫]

বক্তব্যের নিহিতার্থ এই, রুচি এবং সহ্য করার ক্ষমতা অনুসারে মানুষ যেমন বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্ট হয় তেমনি সাধনার ক্ষেত্রে মানসিক প্রবণতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুসারে সাধক যে কোন সাধন-পথে অগ্রসর হয়েই সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রের ‘অধিকারভেদবাদ’ এর ভিত্তিতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অদ্ভুত পরিকল্পনা শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীতে নিহিত আছে। বক্তব্য সহজ-বোধ্য উপমার মাধুর্য্যে মানুষের অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন ভারতবর্ষে এমনি ধরনের উপলব্ধি-নির্ভর বাণীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই বাণীতে যেমন উপলব্ধি সঞ্জাত দৃঢ়তা আছে তেমনি আবার সহজবুদ্ধিগম্য একটা অনুপম আবেদন আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এ-উপদেশের পেছনে একটি প্রশান্ত প্রদীপের মত জ্বলন্ত জীবন থাকায় লোকে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। সেজন্যই দেখি, রামমোহন, দয়ানন্দ ও থিওসফি মত অনেক মূল্যবান তত্ত্ব প্রচার করেও শেষ পর্যন্ত জনজীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাত্ত্বিক বিচারের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা না করেও সাত্ত্বিক জীবন সাধনায় যে বাণী তুলে ধরেছিলেন তা ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছিল। সেজন্যই দেখি তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের সাধারণ লোকের সঙ্গে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত ও প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত ব্যক্তিরাও শ্রীরামকৃষ্ণের চরণোপান্তে এসে সমবেত হয়েছেন। উনবিংশ

৪৫ কথামৃত, ২।২।৩

শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের ধর্মগ্লানি থেকে যে মহাপুরুষ এমনি করে দেশ ও জাতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন ভক্তেরা ভগবদ্গীতার ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাঁকে অবতার বলেন। এটা একান্তভাবেই বিশ্বাসের কথা। এখানে যুক্তি-প্রয়োগ অবান্তর। এ-বিশ্বাস যাদের নেই তারাও নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ যে অসাধারণ সাধক এবং লোক-শিক্ষক ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ করবে না। যিনি সত্যিই বিরাট ও মহান তাঁর চরণে মাথা এমনিতেই নত হয়। বিশ্বের এই প্রণতি-প্রাপ্তির ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন ক্ষমতা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই লক্ষ্যণীয়।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

রাজা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ দু'জন অবিস্মরণীয়, কীর্তিমান পুরুষ। রামমোহন সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা এই ত্রিধারা সংস্কারে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ্যতঃ ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেও শিষ্য বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন। বাংলা তথা ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির যথার্থ প্রগতিতে এঁদের কারও অবদানই কিছু কম নয়।

আপাতঃদৃষ্টিতে অবশ্য রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধ ধ্যান-ধারণার কথাই প্রবল বলে মনে হয়। রামমোহন দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন শাস্ত্রে অবগাহন করে স্নিগ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনায়াস চলাচলের ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং তার সাহায্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন কিছু লেখাপড়া শেখেন নি। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের মূল গ্রন্থ পাঠের প্রশ্নই ওঠে না। তবে তিনি বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের এমন একটা সহজ উপলব্ধির অধিকারী ছিলেন যার তুলনা আমাদেন জানা নেই। রামমোহন ছিলেন মুখ্যতঃ তাত্ত্বিক পণ্ডিত, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তত্ত্বদর্শী সাধক। রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার প্রবর্তক এবং সমস্ত রকমের মূর্তি-পূজার বিরোধী। আর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণী মাতৃমূর্তির পূজারী ব্রাহ্মণ। মূর্তি-পূজা তাঁর মতে নিন্দনীয় নয়, প্রয়োজনীয় ও আদরণীয়।

রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই আপাতঃবিরোধ সত্ত্বেও একটা অন্তঃস্ফূর্ত ঐক্য ছিল বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গ আলোচনা করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রামমোহনের জীবনে জটিলতার অন্ত ছিলনা। মনস্বী লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এ কথা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। রামমোহন সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক এবং একাধারে আরও অনেক কিছু। কিন্তু রামমোহনের জীবনী-রচয়িত্রী মিস কোলেটের মতে ধর্মই তাঁর জীবনের মূল সুর ও ভিত্তি। তিনি বলেন, 'He was above all and beneath all a religious personality. The many and far-reaching ramifications of his prolific energy were forth-puttings of one purpose. The root of his life was religion'.[১]

এই দিক থেকে মুখ্যতঃ ধর্ম ব্যাপারে প্রখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর তুলনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতৃ সাধনা' নিবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদের সাধনায় সঙ্গতি লক্ষ্য করেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সঙ্গতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল—ইতিহাসে যখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় তখনই তার আগে থেকেই সেই আবির্ভাবের আভাস পাওয়া যায়। কবিরা যেন সুর আর মহাপুরুষেরা যেন রূপ; সুর আসে আগে আর মহাপুরুষেরা তার সাকার রূপ হ'য়ে আসেন পরে। সুরের মূর্ছনা রূপের আগমন সূচনা করে। চিত্তরঞ্জন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছেন—চণ্ডীদাস যেন সুর, আর চৈতন্যদেব যেন তারই জীবন্ত রূপ। চিত্তরঞ্জনের মতে—রামপ্রসাদের সুর যেন শ্রীরামকৃষ্ণে সাকার রূপ ধারণ করেছে।

---

১ Miss Collet : Raja Ram Mohan Roy, edited by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguly. p 209.

এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল লেখক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেছেন, 'কবি কল্পনার বাহুল্য সত্ত্বেও, কথাটি ইতিহাস আলোচনার অভিজ্ঞতা-রূপেই অর্জিত হইয়াছিল। কাজেই অবহেলার বস্তু নয়'।[২] আমরা একথার সত্যতা স্বীকার করি। রামপ্রসাদী সংগীত শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল আমরা তা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতৃসাধনা' নিবন্ধেই আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি পরিহারের জন্য সে প্রসঙ্গের অবতারণা আর করছি না।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন প্রথম বলেন যে রামপ্রসাদের সঙ্গে রাম-মোহনের একটা যোগাযোগ ছিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে কথাটা অসম্ভব মনে হলেও সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বসাধক রামপ্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক-আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। সেজন্যই একথার অবতারণা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং অন্যান্য অনেকে রামপ্রসাদ ও রামমোহনের মধ্যে কোন মিলের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কিন্তু আমরা যদি রামমোহনের ব্রাহ্ম সঙ্গীত মনোযোগ দিয়ে পড়ি তা হ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রামমোহন যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

রামপ্রসাদ গেয়েছেন—'অদ্য অব্দে শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হ'বে'। রামমোহন গাইলেন—'অবশ্য ত্যজিতে হ'বে কিছু দিনান্তর।' 'অবশ্য' কথাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—'অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ'। রামমোহন গাইলেন—'অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ' বা 'অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ভ রাগ দ্বেষ।' 'অজপা' অপরিবর্তিত।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, রাম-

১ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে'

মোহন অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে প্রসাদী সঙ্গীত পাঠ করেছিলেন এবং সে সঙ্গীতের বাণী তাকে এতই অনুপ্রাণিত করেছিল যে তিনি সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে সে বাণীর কোন কোন অংশ নিজের সঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক রামমোহনকে রামপ্রসাদের 'তারা আমার নিরাকারা' সঙ্গীতটি নিশ্চয়ই খুব মুগ্ধ করে থাকবে। রামপ্রসাদের সাধনায় যেখানে এই নিরাকার তত্ত্বের কথা আছে এবং যেখানে রামপ্রসাদী সাধনায় অদ্বৈত-সাধনার সুর স্পষ্ট রামমোহন সেখানেই রামপ্রসাদের সহযোগী। অন্যত্র যেখানে রামপ্রসাদ কালীমূর্তি রচনা করে ষোড়শোপচারে তাঁর পুজো করেন, বা মা'র মানস মূর্তির সামনে মানসপুজো করেন তখন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক নিশ্চয়ই তা সুনজরে দেখতে পারেন না। কারণ, রামমোহন সুস্পষ্ট-ভাবেই বলেছেন, 'বস্তুত, কি মানস-মূর্তির অবলম্বন করিয়া, কি হস্ত-নির্মিত মূর্তির অবলম্বন করিয়া, উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা হইবে।' রামমোহন সমস্ত রকমের সাকার উপাসনার বিরোধী। সুতরাং এই দিক থেকে সাকার উপাসক রামপ্রসাদ এবং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক রামমোহনের প্রভেদ সুস্পষ্ট। আমাদের বক্তব্য এই, রামপ্রসাদ ও রামমোহনের প্রভেদ যেমন স্পষ্ট, মিলও তেমনি স্পষ্ট।

রামপ্রসাদ সুস্পষ্টভাবেই জানতেন, যাঁকে তিনি সাকার শ্যামারূপে পুজো করছেন তিনি আসলে নিরাকার ব্রহ্ম। এ কথার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে একটি রামপ্রসাদী গানে। প্রসাদ গাইছেন—

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে সাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।

এই গানের গায়কের সঙ্গে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক রামমোহনের মিল অস্বীকার করার উপায় আছে কি ? আবার এই গানের গায়কই যখন সাকার শ্যামা মায়ের মূর্তির কাছে বসে শিশুর মত আদর-আবদার

স্নেহ-সোহাগ, তর্জন-গর্জন শুরু করে দেবেন, তখন এই সাকার উপাসকের সঙ্গে নিরাকার-উপাসক রামমোহনের পার্থক্যই বা অস্বীকার করবে কে? ধর্মের উচ্চতম প্রকাশ যে নিরাকার উপাসনায় রামপ্রসাদ তাকেও যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি স্বীকৃতি দিয়েছেন নিম্নাধিকারীদের সাকার উপাসনাকে। ধর্মের উচ্চ প্রকাশ ও নিম্ন প্রকাশ দুইই রামপ্রসাদের সস্নেহ সমর্থন লাভ করেছে। রামমোহন ধর্মের উচ্চতম প্রকাশকেই স্বীকার করেছেন, ক্ষমাহীন ঘৃণায় বর্জন করেছেন ধর্মের নিম্নপ্রকাশকে। রামপ্রসাদ ও রামমোহনের ধর্ম-ধারণার পার্থক্যের এটাই মূলভিত্তি বলে মনে করি।

অনুরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামমোহনের মধ্যে ও মিল এবং গরমিল প্রদর্শন করা যায়। বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদের প্রতি রামমোহনের অনুরক্তি সর্বজনবিদিত। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রটিকেই জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবার রামপ্রসাদের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নামরূপভেদ"।[৩] বক্তব্য আরও বিশ্লেষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি;—অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না"।[৪]

---

৩ কথামৃত, ১।২।৪
৪ ঐ ১।২।৪

ওপরের আলোচনা যদি গভীর ভাবে অনুধাবন করা যায় তবে বলতে হয় ভবতারিণী জননীর পূজারী আসলে ব্রহ্মেরই উপাসক ছিলেন। কারণ, এই পূজারীর মতে—'কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।' রামমোহন যেমন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি আসলে নিরাকার ব্রহ্মেরই পূজক ছিলেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীকে ব্রহ্ম বলে মনে করতেন তিনি আরও বলেছেন, 'কালী নির্গুণা'...। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের 'তারা আমার নিরাকারা' সঙ্গীতটি স্মরণীয়।

রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় এই দিক থেকে মিল থাকলেও এঁদের প্রভেদও লক্ষ্যণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কালীরূপী ব্রহ্ম "নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী"।[৫] শ্রীরামকৃষ্ণের মতে—দূর থেকে দেখলে তিনি কালো, কিন্তু কাছে এলেই নির্গুণা। উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝাচ্ছেন বক্তব্য—"সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছ্যাখ রং নাই"।[৬] রামমোহন এসব কথা মানবেন না। তিনি একমাত্র নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী, সগুণ ও সাকার ব্রহ্মোপাসনায় তাঁর কোন বিশ্বাস নেই। তিনি সুস্পষ্টভাবেই সাকার উপাসনার নিন্দা করেছেন।

রামমোহনের জীবনী পাঠে[৭] জানা যায়, রামমোহন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ না করলেও সাধনার ক্ষেত্রে জাতিভেদ স্বীকার করতেন না। জাতিভেদ দেশের অনেক ক্ষতি করছে, এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রাহ্মণ হয়েও জাতিভেদে আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সবাইকেই দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন সেই বিবেকানন্দ ত অব্রাহ্মণ। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাধকশ্রেষ্ঠ (সাধকদের মধ্যে রক্তচক্ষু রুই

---

৫ কথামৃত ৩।১০।৫
৬ ঐ ১।২।৪
৭ Collet: Raja Rammohon Roy, edited by D. K. Biswas and P. C. Ganguly, p. 213.

মাছ) বলে মনে করতেন। বিভিন্ন জাতির এঁটো শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে পরিষ্কার করেছেন, একথা সকলেরই জানা আছে। রসিক মেথর পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেয়েছিল।

রামমোহনকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। আমাদের মতে—শ্রীরামকৃষ্ণেরও বাংলা সাহিত্যে কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয়ও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে···সহজ উপমা দিয়া কথা বলিবার ধরন শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম প্রচলন করিয়াছেন।' আমরা এই মত সমর্থন করি। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের উপমার খুবই খ্যাতি। আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের বিভিন্ন কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সহজ অথচ অব্যর্থ উপমার ব্যবহার করেছেন তার তুলনাও বাংলা সাহিত্যে বেশী নেই। আমরা এইখানে মাত্র একটি উপমা উদ্ধার করব। কৌতূহলী পাঠক 'কথামৃত' ও 'রামকৃষ্ণপুঁথি' পাঠ করলে এমন উপমা অনেক পাবেন। ব্রাহ্মধর্ম এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মের পার্থক্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুজন শানাই-বাদকের উপমা দিয়ে অননুকরণীয়ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"একজনে পোঁ ধরিয়া সুর দিতে হয়। অপরে বাজায় রাগ রাগিনী নিচয়। পোঁ ধরা এ ব্রাহ্ম ধর্ম একসুর তায়। হিন্দুয়ানী নানা রাগ-রাগিনী বাজায়"।[৮] বক্তব্য এই, ব্রাহ্মধর্মে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকৃত, কিন্তু হিন্দুধর্মে সাকার-নিরাকার সমস্ত রকমের উপাসনাই সমর্থিত। উপমা বক্তব্যকে অব্যর্থভাবে সুস্পষ্ট করেছে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন, রামমোহন ভারতবর্ষে প্রথম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রবর্তন করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে গ্নস্‌টিকদের (Gnostics) মধ্যে প্রথম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। গ্নসৃটিকেরা 'Rational Theology'

---

৮ রামকৃষ্ণ পুঁথি—২৯৪ পৃষ্ঠা

নাম দিয়ে তৎকালে প্রচলিত এবং পরিচিত বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টজন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেকার ব্যাপার। তৃতীয় এবং চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ো প্লেটোনিস্টরাও (Neo-Platonists) তুলনামূলক ধর্মের আলোচনার ধারা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু, রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র ধর্ম এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'ল। ফলে তখন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আর কারও কোন উৎসাহ দেখা গেল না। মধ্যযুগে ত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোতে খ্রীষ্টধর্মের একছত্র প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা বর্তমান ছিল, অন্য ধর্মের সেখানে কোন প্রতিষ্ঠাই ছিল না। সুতরাং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় কেউই আগ্রহ প্রকাশ করেনি। পরবর্তী-কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ধর্মের প্রাধান্য অস্বীকার করার মনোভাব জাগিয়ে তুললো মানুষের মধ্যে। খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য গেল কমে। তুলনামূলক ধর্মের কথা তখন বলবে কে? উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা পুনরারম্ভ হ'ল। আমাদের দেশে এ আলোচনার পত্তন করলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন আরবী শিখে কোরাণ পাঠ করলেন মুসলমান ধর্মের সার কথা জানার জন্য। সংস্কৃত শিখে পাঠ করলেন হিন্দুদের বেদ-বেদান্ত এবং হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখে পাঠ করলেন খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি-স্থানীয় গ্রন্থ বাইবেল। তারপর বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলেন, একেশ্বরবাদই সর্বধর্মের সার কথা; অন্য যা কিছু তা সবই দেশাচার, লোকাচার এবং বিভিন্ন সংস্কারের বিষময় ফল। পারসী ভাষায় লেখা তুহফৎ-উল-মুবহিদ উদ্দিন 'Tuhfat-ul-Muwahiduddin' গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে পূর্বলিখিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা আরবীতে লেখা। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এখনও

পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তিনি 'The Discussions on Various religions' নামে আর একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায় যে, এই গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন এবং ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমস্ত ধর্মেরই মূল বাণী যে এক (একেশ্বরের স্বীকৃতি এবং তাঁর উপাসনা) এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেই রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মের উপসানাকে সার্বজনীন ধর্মরূপে প্রচার করেছিলেন। রামমোহনের মতে[৯] তিনি যে ব্রাহ্মধর্মের প্রচাব করেছিলেন তা সার্বজনীন ধর্ম এবং সমস্ত ধর্মের সার কথাই তিনি তাতে গ্রহণ করেছিলেন।

সমস্ত ধর্মই শেষ পর্যন্ত সত্য পথ নির্দেশ করে এ বিষয়ে রামমোহন নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। একদিন তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা শ্রেষ্ঠ ধর্ম কোন্‌টি, এ প্রশ্ন করায় রামমোহন জবাবে বলেছিলেন, বিভিন্ন গরু যেমন একই রকম সাদা দুধ দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম একই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তাদের মত ভিন্ন, কিন্তু তাঁরা একই উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হ'ন।[১০] এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের

---

৯ 'Rammohan Roy before leaving for England, told him (Babu Nandakishore Bose) that the followers of every prevailing religion would reckon him, after his death, as one of their co-religionists. The Mohammedans would call him a Mohammedan, the Hindus would call him a Vedantic Hindu, the Christians unitary christian. But Babu N. Bose (Nandakishore Bose) added, 'he really belonged to no sect. His religion was Universal Theism' (Collet : Raja Rammohun Roy, edited by D. K. Biswas & P. C. Ganguly P 369—70)

১০ 'His youngest wife Uma is said to have asked him which religion was the best and highest ? Rammohan is said to have replied : 'Cows are of different colours, but the colour of the milk they give, is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is to adopt the true path ;—i.e., to live a faithful life.' (Collet : Raja Rammohun Roy, edited by D. K Biswas & P. C. Ganguly P 33.)

'যত মত তত পথ' কথাটি স্মরণে আসে। আরও মনে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, জলকে water, পানি প্রভৃতি যা-ই বলা হোক্ না কেন তৃষ্ণা তা নিবারণ করবেই এবং লোকে একই ফল পাবে।

রামমোহন যে সার্বজনীন ধর্মপ্রচার করেছিলেন তার মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দু ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের অনুকরণেই তিনি চার্চ বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেখানে খ্রীষ্টধর্মের অনুকরণেই সমবেত প্রার্থনা হ'ত, বাইবেল পাঠের মত বেদ-উপনিষদ পড়া হ'ত এবং খ্রীষ্টানদের ধর্ম-সঙ্গীতের মত ব্রাহ্ম-সঙ্গীত গীত হ'ত। আবার হিন্দু ধর্মের উপনিষদ গ্রন্থের 'ওঁ', 'তৎসৎ', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি মন্ত্রই ছিল এই ধর্মের মূল মন্ত্র। রামমোহন যে পোষাক পরিধান করতেন তা ছিল বিশেষভাবে মুসলমানের পোষাক। এইভাবে তিনি নিজের জীবনে মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। প্রত্যেক ধর্মের সার কথার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ধর্ম ব্যাপারে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। রামমোহনের 'প্রার্থনা পত্র'-এর ছত্রে ছত্রে এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপর ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে রাম-মোহন লিখেছেন -'ভ্রাতৃভাব আচরণ করা কর্তব্য', 'অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য,' 'বিরোধীভাব কর্তব্য নহে' প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা ত সর্বজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"যতবিধ আছে ধর্ম সবে নমস্কার, ইদানীং ব্রাহ্মধর্ম যাহা ছড়াছড়ি। ইহাকেও বার বার নমস্কার করি"।[১১]

রামমোহনের মতই শ্রীরামকৃষ্ণ সবধর্মের সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে ত 'সর্বধর্ম সমন্বয়ের ঋষি'ই বলা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে

১১ রামকৃষ্ণ পুঁথি—২৯৪ পৃষ্ঠা

বলে মনে করি। রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের তাত্ত্বিক আলোচনা বা তুলনামূলক ধর্মালোচনার ভিত্তিতে সমস্ত ধর্মই স্বরূপতঃ এক, এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। রামমোহনের এ সিদ্ধান্ত ছিল একান্ত ভাবেই তাত্ত্বিক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। কিন্তু, সহজ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছেন, 'যত মত, তত পথ', তখন একথা কোন চর্চালব্ধ সিদ্ধান্ত নয়, চর্য্যালব্ধ বা উপলব্ধিসঞ্জাত অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মপথে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মুসলমানধর্ম-সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ দাড়ি রেখে-ছিলেন, কাছা দেন নি, মসজিদে নামাজ পড়েছেন, আবার খ্রীষ্টান ধর্ম-সাধনকালে খ্রীষ্টভক্তের মত আচরণ করেছিলেন। তিনি যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে যীশুর একটি ছবি ঝুলানো ছিল। সে ছবিটি এখনও সেই ঘরে ঝুলানো আছে। তিনি নারীভাবে সাধনা করেছেন, হনুমান ভাবে সাধনা করেছেন আবার কর্তাভজাদের দলে মিশে সেভাবেও সাধনা করেছেন। বিভিন্ন ধর্ম ভাবে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন—"আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এমত ভাল না। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে, God, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে water, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি, কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়"।[১২] একথা অভিজ্ঞতা-নির্ভর বলে রামমোহনের চর্চা-নির্ভর কথার চেয়ে মানুষের মনে অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে। অভিজ্ঞতা-নির্ভর কথার গভীরতা

---

১২ কথামৃত, ৩।৪।৪

আমরা চর্চা-নির্ভর কথার গভীরতার চেয়ে অনেক বেশী বলে মনে করি।

অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা রামমোহনের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বেশী ছিল বলে মনে হয়। রামমোহন সাকার উপাসনার প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন এবং এ উপাসনার প্রতি নির্মম কষাঘাত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার দৃষ্টিতে অধিকারীভেদে সাকার-নিরাকার সমস্ত সাধনারই তাৎপর্য স্বীকৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি অদ্বৈতবাদী তোতাপুরীর নিকট দীক্ষা নিয়ে অদ্বৈত-সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধির অধিকারী হয়েছিলেন, আবার ভৈরবীর নিকট তন্ত্র-সাধনায় দীক্ষা নিয়ে সাকার-উপাসনা করেও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যখন বলেন—"এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে"[১৩], তখন সেকথার সত্যতা অস্বীকার করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। যিনি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন তাঁকে অবিশ্বাস করা দায়।

রামমোহন সমস্ত ধর্মের সারবত্তা স্বীকার করেও প্রচলিত ধর্ম ভিন্ন একটি নূতন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা এই ধর্মকে ব্রাহ্মধর্ম নামে জানি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এই ধর্মের মূলকথা। এই ধর্ম প্রচলিত হিন্দুধর্ম নয়, ইসলাম ধর্ম নয়, আবার খ্রীষ্টান ধর্মও নয়। তবে এই সমস্ত ধর্মেরই সারকথা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত সমস্ত ধর্মই অভীষ্ট লাভের সহায়ক হ'তে পারে, একথা নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন বলেই তিনি প্রচলিত ধর্ম ভিন্ন অন্য আর একটি ধর্মমত প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। আমাদের মনে হয়, এতে যেন সর্বধর্মের সারবত্তায় বিশ্বাসের গভীরতা রামমোহনের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ আমেরিকায় ধর্ম-

১৩ কথামৃত, ১।১।৪

মহাসম্মেলনে যখন বলেছিলেন, আমার মতে মুসলমানকে হিন্দু হ'তে হবেনা, খ্রীষ্টানকেও হিন্দু হ'তে হবে না, আবার হিন্দুর পক্ষেও মুসলমান বা খ্রীষ্টান হবার দরকার নেই ; হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান সবাই যে যার পথ অনুসরণ করে ধন্য হবেন, তখন বিশ্ববাসী শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিকল্পনার গভীরতার কথা উপলব্ধি করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন। আমাদের ধারণা—সমস্ত ধর্মই যদি স্বরূপতঃ সত্য হয়, তবে সত্য-পথ নির্দেশের জন্য আর একটি ধর্মমত এবং ধর্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার সত্যিকারের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ একথা বিশ্বাস করতেন বলেই নিজে প্রচলিত ধর্ম ভিন্ন কোন নূতন ধর্ম প্রচার করেননি, নূতন ধর্ম-সমাজেরও প্রতিষ্ঠা করেননি।

রামমোহনের মত শ্রীরামকৃষ্ণও ধর্মের বহিরঙ্গকে ধর্মের স্বরূপ বলে ভুল করেননি। ধর্ম উভয়ের দৃষ্টিতেই উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করে। ধর্মের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার উভয়ই বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য নিরলস চেষ্টা এবং এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের কথা মনে পড়ে। এক সময় সতীদাহ প্রথা ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করা হ'ত। রামমোহন এই অমানুষিক, নৃশংস প্রথা কখনই ধর্ম-সমর্থিত হ'তে পারে না, একথা দেশবাসীকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে-ছিলেন। তারপর তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ককে মুখ্যতঃ রামমোহনই এই নৃশংস প্রথা রদ করার জন্য আইন প্রণয়নে প্ররোচিত করেন। প্রথমতঃ ইংরেজ সরকার দেশবাসীর ধর্মধারণায় হস্তক্ষেপ করতে চাননি। রামমোহনই তখন হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থেই অমানু-ষিক প্রথার সমর্থন নেই, একথা ইংরেজ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং সতীদাহ প্রথা রদ-ব্যাপারে রামমোহনের অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণও তৎকালীন তন্ত্রসাধনার সঙ্গে সংযুক্ত

পশ্বাচার সাধনা যে কোন কাজের জিনিষ নয়, একথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। বীরাচার সাধনা প্রভৃতি নিকৃষ্ট যৌন সম্পর্কিত সাধনার তিনি নিন্দা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে মাতৃসাধনা বা তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ হয়েও কখনও কারণ-বারি পান করেননি বা বীরভাবে সাধনা করেননি। এগুলো ধর্ম সাধনার কোন অঙ্গ নয় বলেই তিনি মনে করতেন।

ধর্মব্যাপারে কুসংস্কার বর্জিত উদার মনোভাবের জন্য রামমোহন সমাজপতিদের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং এক সময় তাঁর জীবন পর্যন্ত সংশয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, তবু তিনি যা অন্যায় বা অসত্য বলে মনে করেছিলেন, তার সঙ্গে আপস করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণও পূজো প্রভৃতি ব্যাপারে সাধারণ রীতি অনুসরণ করতেন না বলে একসময় দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দির থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুরা শ্রীরামকৃষ্ণের আচার-আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমর্থন করতেন না। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-প্রাপ্তির আনন্দে এতই বিহ্বল থাকতেন যে এ সমস্ত সমালোচনা ও আক্রমণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারতো না।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের দুই যুগন্ধর পুরুষ রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক দিক থেকেই ভাবসাম্য প্রকাশ করেছিলেন, যদিও তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি যেমন সাকার উপাসক শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন, রামমোহনও সাকার উপাসনার ঘোর বিরোধী হওয়া সত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের কালে জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে মুগ্ধ হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মকে নমস্কারই করেছেন।[১৪]

১৪ রামকৃষ্ণ পুঁথি, ২৯৪ পৃষ্ঠা

সর্বশেষে বলি, যদিও আমরা রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের সমানধর্ম উপলব্ধির চেষ্টা করেছি, তবু স্বীকার করি ইতিহাসে তাদের পরিচয়ে পার্থক্য থাকবেই। রামমোহন মুখ্যতঃ বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সচেতন সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, আর শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ্যতঃ সহজ-সরল, ভাব-বিহ্বল, তন্ময় সাধক।

—শেষ—

গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীম কথিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ

অক্ষয়কুমার সেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

ঐ —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা

৺সুরেশ চন্দ্র দত্ত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—তীর্থরেণু

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ—ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সমন্বয়

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাস

ক্ষিতীমোহন সেন—বাংলার বাউল

ঐ —মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাউল সাধনা

Dr. A. C. Das—A Modern Incarnation of God.

Dr. S. C. Chatterjee—Classical Indian Philosophies—Their Synthesis in the Philosophy of Sri Ramkrishna

Collet—Raja Ram Mohan Ray

Swami Abhedananda—Memoirs of Sri Ramkrishna

লেখক
ইবান তুর্গেনেফ

(৬) রুডিন

অনুবাদক
শৌরীন চৌধুরী

এই উপন্যাসখানি স্বৈরাচার-পীড়িত, জার-শাসিত রাশিয়ার বাস্তব আলেখ্য।

"স্বচ্ছ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ, কোথাও ভাষার জড়তা নাই।"—দেশ মূল্য ৩·০০

লেখক
এমিল জোলা

(৭) থেরেসা

অনুবাদক
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

থেরেসার বিবাহ হয় এক ক্ষীণজীবীর সঙ্গে, তাই স্বামী থাকা যে কি জিনিস তা সে জানত না। একদিন তার স্বামী এক বন্ধুকে বাড়ী নিয়ে এল—বলিষ্ঠ প্রাণচঞ্চল লর‍্যাকে। এরই পরিণতি হিসেবে যে অবৈধ সংঘটন ঘটল, এই উপন্যাসখানি তারই অগ্নিগর্ভ কাহিনী।

"অবিনাশচন্দ্রের অনুবাদে বাঙালী পাঠক জোলাকে পুরোপুরি পাবেন, সেই সঙ্গেই পাবেন বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী কত তীক্ষ্ণ ও সাবলীল হয়ে আসচে, তার নিঃসংশয় পরিচয়।"—যুগান্তর ৫·০০

লেখক
সমারসেট মম

(৮) দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স্‌পেন্স

অনুবাদক
অনিল চট্টোপাধ্যায়

এই উপন্যাসে ফরাসী শিল্পী পল গগ্যাঁর প্রতিভূস্বরূপ মিঃ স্ট্রিকল্যাণ্ড চরিত্রে মম যে নিপুণতার সঙ্গে শিল্পীর জীবন ও জীবনাদর্শ চিত্রিত করেছেন তার তুলনা মেলে না।

"অনুবাদক মমের এই শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসখানি বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের আসরে উপস্থিত ক'রে আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন নিঃসন্দেহে।" —দৈনিক বসুমতী মূল্য ৫·০০

লেখক
সমারসেট মম

(৯) অফ্‌ হিউম্যান বণ্ডেজ

অনুবাদক
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

ভাগ্যহত, বেদনাক্ষুব্ধ, নিপীড়িত মানুষকে নূতন প্রেরণায়, নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত ক'রে তার জীবনকে শান্তিময় ক'রে তোলাই হ'ল এই উপন্যাসখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণেই তা বিশ্বের আদরের সামগ্রী। মূল্য ৮·৫০

"বিদেশী সাহিত্যকে নিজের ঘরের মত করে উপস্থাপিত করার কৃতিত্বে বাঙালী পাঠকের অকুণ্ঠ সহানুভূতি লাভ করবেন অনুবাদক"—দেশ

লেখক
ডি. এইচ.
লরেন্স

(১০) সন্স অ্যাণ্ড লাভার্স

অনুবাদক
ধীরেশ ভট্টাচার্য ও
বিশু মুখোপাধ্যায়

দুঃখ কষ্ট দারিদ্রের মধ্যেও মানুষের মনের স্বাভাবিক স্নেহ প্রেম ভালবাসার বৃত্তিও যে কিরূপ সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে এই উপন্যাসে তারই শিল্পরূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

মূল্য ১০·০০

লেখক
স্ট্যানলি আন্‌উইন

(১১) প্রকাশনের মূলকথা

[The Truth About Publishing]

অনুবাদক
সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রকাশন সম্বন্ধে আর এমন কোন গোপন তথ্য নেই, যা এতে ফাঁস ক'রে না দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই ধরনের এই প্রথম। (প্রকাশিতব্য)

॥ রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থমালা ॥

॥ ডঃ শচীন সেন ॥

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপূত একমাত্র আলোচনাগ্রন্থ। কবির নিজের ভাষায়—"তোমার এই গ্রন্থে কবিকে বহু যত্নে ও সন্ধানে বিচিত্র করে দেখেছ।" (পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ১১·০০

"এই সুপাঠ্য গ্রন্থ যেমন সমালোচক ও রসিক সমাজে, তেমনিই শিক্ষা নিকেতনে সমানই আদরনীয় হইবে।"—যুগান্তর

॥ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

দুই কবি

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের কাব্যালোচনা। মূল্য ৪·৭৫

"দুই কবির কোন তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা তিনি করেননি। লেখক তাঁর আত্মিক অনুভূতি প্রকাশের ভেতর দিয়ে গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কবি-কর্মের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে আদরনীয় হবে।"

—দেশ

॥ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ॥

কবিগুরু

রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র। (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) মূল্য ৪·৫০

"...তাঁহার গ্রন্থখানি পড়িলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অনেক স্ববিরোধী চিন্তা, অনেক অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা ধারণার যে প্রতিষেধ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।..."

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ প্রমদারঞ্জন ঘোষ ॥

আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও শিক্ষাদান-পদ্ধতির বহু অজ্ঞাত তথ্যে গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের সশ্রদ্ধ স্মৃতি-কথা। মূল্য ৪·৫০

"বইটি একটি কালের কাহিনী কেবল নয়, এটি একটি স্থানেরও ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠ কয়েকজন কর্মীর জীবনের ইতিবৃত্তও।"—দেশ

॥ শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী ॥

বাহির-বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

বাহির-বিশ্বে তথা য়ুরোপে ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ, কি-ভাবে গৃহীত হয়েছিলেন, সেই সমস্ত প্রামাণিক তথ্য এই গ্রন্থে নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) মূল্য ৬·৫০

"...এই গ্রন্থ প্রণয়নে দুষ্প্রাপ্য বিষয়সমূহ সংগ্রহে লেখকদ্বয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।... রবীন্দ্র-ছাত্রদের নিকট ইহার মূল্য অনেক বেশী।"—দেশ

॥ যামিনীকান্ত সোম ॥

ছোট্ট রবি

ছোটদের জন্য লিখিত রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক মনোরম আলেখ্য। ৭ম সংস্করণ। মূল্য ১·৪০

"লেখকের অনবদ্য রচনা কৌশলে রবীন্দ্রনাথের শিশু-জীবনের সামান্য ঘটনাগুলিও রূপরসে সঞ্জীবিত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির শিশুদের জন্য রচিত ছড়াগুলিও সুসন্নিবিষ্ট হওয়ায় খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"—দেশ

• কয়েকটি ভিন্ন স্বাদের বই •

॥ প্রবন্ধ—ভ্রমণ—সঙ্গীত—সমালোচনা ॥

দেহ রক্ষণা (দেহ-বিজ্ঞান)	ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য	২.৫০
বাংলার রূপরস সাধনা	যামিনীকান্ত সেন	২.৫০
গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ	বিমল দত্ত	১.৭৫
বাংলা-ভাষার শিক্ষাপদ্ধতি	কল্যাণী কার্লেকার (৫ম সং)	৬.৫০
জাহ্নবী যমুনার উৎস-সন্ধানে	জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায়	৩.৫০
সঙ্গীত-পরিক্রমা (নূতন সংস্করণ)	নারায়ণ চৌধুরী	৮.০০
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান (৪র্থ সং)	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	৬.০০
আঃ বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২.৫০
আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	৬.০০

॥ উপন্যাস—নাটক ও গল্প ॥

পাহাড়ী সন্ধ্যা (রোমাণ্টিক চিত্র)	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	২.৫০
রোশনচৌকি (রোমাণ্টিক চিত্র)	রমাপতি বসু	২.৭৫
বৌ-রাণী (রোমাঞ্চকর চিত্র)	বীরেন দাশ	৪.৫০
তপতীর তৃষা (রোমাণ্টিক চিত্র)	রমাপতি বসু	৪.০০
শৃঙ্খলিতা (ঐতিহাসিক চিত্র)	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	৩.৫০
বঙ্গবিজেতা (ঐতিহাসিক চিত্র)	রমেশচন্দ্র দত্ত	২.৫০
চক্রবৎ (আধুনিক জীবন চিত্র)	বিষ্ণুপদ বন্দোপাধ্যায়	৪.০০
দু'টি সরস নাটক (অম্ল-মধুর ও প্রজাপতি)	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	২.৫০
মারকে লেঙ্গে (ব্যাঙ্গ ও রঙ্গ)	পরিমল গোস্বামী	৪.০০
বসন্তে (২য় সংস্করণ)	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫.৫০
প্রেমের গল্প (শ্রেষ্ঠ লেখকদের)	বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	৭.৫০
শিশির বসন্তে	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫.৫০
মহাভারতের গল্প	অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল	৪.০০

॥ ছোটদের ॥

ছোট্ট শরৎ (জীবনী)	যামিনীকান্ত সোম	২.০০
ছোট্ট গান্ধী ঐ (৪র্থ সংস্করণ)	ঐ	০.৯৪
মানুষের বন্ধু (২য় সংস্করণ)	পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১.৫০
লে মিজেরাবল (ভিক্তর হুগো)	শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ অনূদিত	৩.০০
গল্পে বিচিত্র বিজ্ঞান	বিমলাংশুপ্রকাশ রায়	২.৫০
শিশুরঞ্জন রামায়ণ (৪১শ সং)	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১.২৫
শিশু-কবিতা (১২শ সংস্করণ)	সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র সংকলিত	১.২৫